ফিয়ার্স লেন

নবেন্দু ঘোষ

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

সাহিত্যিক-অগ্রজ

গোপাল হালদার

করকমলেষু

ভূমিকা

এই উপন্যাসের পশ্চাদ্‌বর্তী ছোট্ট ইতিহাসটিকে না বললে নানা ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে ব'লে কয়েকটি কথা না ব'লে পারছি না।

গত ১৯৪৬ সালের প্রথমভাগ থেকে আমি আমার এক দাদা'র ওখানে থাকতাম। তাঁর বাসা ছিল ফিয়ার্স লেন ও সাগর দত্ত লেনের সংযোগস্থলের কাছাকাছি। ১৬ই আগস্টের দাঙ্গায় আমি ঐ বাড়িতেই আট্‌কা পড়েছিলাম। বাঁশ প্রভৃতির সাহায্যে ঐ বাড়ির ছাদ ও অন্য বাড়ির ছাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি এবং এমনিভাবে পর পর দুটি বাড়ি অতিক্রম ক'রে, নানা বিপজ্জনক অবস্থার ভেতর দিয়ে, পরদিন দুপুরবেলা আমরা মেডিক্যাল কলেজের খোলা মাঠে আশ্রয় নিই ও সেখান থেকে দু'দিন বাদে নিরাপদ স্থানে যাই। অনেক দিন ফিয়ার্স লেন এলাকায় থেকে ও দাঙ্গার সময়কার ঘটনাবলী লক্ষ্য করার ফলেই এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়েছে। এর ভাল মন্দ অধিকাংশ চরিত্রই আমার দেখা—তাঁরা নিছক কল্পনাপ্রসূত নন।

এই উপন্যাস সর্বপ্রথম ১৩৫৩ সালের শারদীয়া 'আজকালে' বড় গল্পের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে সমস্ত বক্তব্য শেষ না হওয়াতেই বর্তমান রূপ দিতে বাধ্য হয়েছি।

দু' একজন বন্ধু আমায় বলেছিলেন যে, এই গ্রন্থে দাঙ্গার একটি দিককেই শুধু দেখানো হয়েছে। কথাটা আমি স্বীকার করি, তার কারণ আমার অভিজ্ঞতা। কাহিনী যে সময়ের

সে সময় আমি ফিয়ার্স লেন এলাকাতেই ছিলাম, সুতরাং হিন্দুপাড়ার দিকটা তখন আমার অজানা ছিল। পরে অবশ্য হিন্দুপাড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে নানা গল্প লিখেছি। তা ছাড়া আমার মনে হয় যে, একদিকের ছবি অন্যদিকের ছবিকেও উদ্ঘাটিত করবে। দাঙ্গা দু'তরফ থেকেই হয়েছিল এবং তার চেহারা একই। দু'পক্ষেই ভালমন্দ লোক ছিলেন এবং তাঁরা সাধ্যানুযায়ী সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং 'ফিয়ার্স লেন' একটা মুসলমান এলাকার কাহিনী হ'লেও তা অন্য যে কোনো হিন্দু এলাকারও কাহিনী বটে। সাড়ম্বরে যে কথাটিকে আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি তা এই যে, সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতাকে আমি সমর্থন করি না। ফিয়ার্স লেনেও মানুষের মহৎ আত্মার যে পরিচয় আমি পেয়েছি এবং এই উপন্যাসে বর্ণনা করেছি, তা থেকেই হয়তো আমার এই বিশ্বাস প্রমাণিত হবে যে, মানুষের ভবিষ্যৎ মহৎ, সাম্প্রদায়িকতা ও সাময়িক পশুবৃত্তি তাকে অন্ধকার করার চেষ্টা করলেও সফলকাম হবে না, মনুষ্যত্বই জয়ী হবে।

দাঙ্গাই সবচেয়ে বড় কারণ যার জন্য গ্রন্থ-প্রকাশে বিলম্ব হ'ল। অল্প সময়ের মধ্যেই বইয়ের ছাপা শেষ হয়েছে ব'লে হয়তো কিছু ছাপার ভুল থাকতে পারে—সে ত্রুটি মার্জনীয় ব'লে আশা করি। ইতি

২০, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯
২৮শে সেপ্টেম্বর
১৯৪৬ সাল

গ্রন্থকার

গলিটার নাম ফিয়ার্স লেন।

বৌবাজার থেকে কলুটোলা পর্যন্ত একটা কুৎসিত অজগরের মত এঁকেবেঁকে গেছে ফিয়ার্স লেন। গলির প্রথমাংশে চীনারা থাকে—কাঠের খড়ম পায়ে, একটু ন্যুব্জদেহে, খুট্ খুট্ ক'রে হেঁটে বেড়ায় গর্ভিনী চীনা নারীরা; ঢোলা পাজামা প'রে ঘুরে বেড়ায় স্থবির মোড়লেরা। দোসাদদের শূয়োরের আর মুসলমানদের গোমাংসের দোকানে ভর্তি এই গলিটাতে একটা থম্‌থমে ভাব সারাক্ষণই লেগে আছে।

তার পরেই মুসলমানদের পাড়া। ভদ্রলোক, ছোটলোক, ধনী, দরিদ্র সর্বশ্রেণীর মুসলমান আছে। এই এলাকার একটা মস্ত বড় অংশ অপরাধ-প্রবণ এলাকা ব'লে পরিচিত। চুণাগলি থেকে সান-ইয়াৎ-সেন স্ট্রীট পর্যন্ত সাধারণ সময়েই পুলিসের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে; দাগী গুণ্ডা, অনির্দিষ্ট পেশার লোক, যুদ্ধের যুগের দালাল, নারী-ব্যবসায়ী, পকেটমার প্রভৃতি বিস্তর আছে এই এলাকায়। আর আছে চোরা-কারবারের মালিকেরা, নিষিদ্ধ চালানের কর্তারা। প্রখর দিবালোকে—যখন জীবনকে অত্যন্ত নিরাপদ মনে হয়, যখন মাথার ওপরকার ঝক্‌ঝকে আকাশে কোনো অন্ধকার হিংস্রতার চিহ্ন থাকে না—তখনও এই গলি দিয়ে যাবার সময় গাটা ছম্‌ছম্ ক'রে ওঠে।

গলির মুখে পেঁয়াজ-রশুন-আলু-পটলের খোসা স্তূপীকৃত হয়ে থাকে এবং তারই পাশে উচ্ছিষ্ট হাড় মাংস ও মাছের কাঁটা খেয়ে খেয়ে যে দেশী কুকুরগুলো ব্লাড্-হাউণ্ড হয়ে উঠেছে তারা ব'সে ব'সে জিভ বের ক'রে হাঁপায়। মাঝে মাঝে পাড়ার এঁচড়ে-পাকা অল্পবয়সী ছেলেগুলো এই কুকুরগুলোর ল্যাজের সঙ্গে ভাঙা টিন বেঁধে দিয়ে তাড়া করে। রসিক মুরুব্বিরা সশব্দে হেসে উঠে হাততালি দিয়ে বলে, 'বাহবা, সাবাস্ ওস্তাদ—'

পান-বিড়ির দোকান, দর্জির দোকান, ছোট ছোট স্টেশনারি শপ, পেশোয়ারী মহাজনদের বড় বড় কাঁচা চামড়ার গুদাম, শিক্-কাবাব-সাজানো নোংরা 'তাজমহল' হোটেল, আলু, পিঁয়াজ আর গোলাপী সরবতের দোকান, চার-পাঁচটা হিন্দু স্যাকরার বিপণি, একটা হোসিয়ারী ফ্যাক্টরি—এই সবেই ফিয়ার্স লেন ভর্তি। তার দু'পাশের বাড়ির জানলায় আর পর্দায় ঝোলে চিক, মধ্যাহ্নে আর সন্ধ্যার পরে উগ্রমসলাযুক্ত মাংসের তরকারির গন্ধ কাঁচা চামড়ার ভ্যাপসা গন্ধে ভারী বাতাসকে আরো ভারী ক'রে তোলে। পানে পিচে গলি রঞ্জিত হয়, সিকনি ও কফে অস্বাস্থ্যকর হয়। আর মেহেদী-লাগানো দাড়িওয়ালা বুড়োদের গড়গড়ার ধোঁয়া কুণ্ডলীকৃত উড়ন্ত সাপের মত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়; বিচিত্র এই ফিয়ার্স লেনে কোথাও সুরুচির ছাপ নেই। আছে কেবল থম্থমে, স্যাঁৎস্যেঁতে, অস্বাস্থ্যকর ও ভয়াবহ একটা আবহাওয়া, অজ্ঞাত আতঙ্কের পীড়াদায়ক একটা অনুভূতি।

আর যখন রাত হয়, কুৎসিত অজগরের মত আঁকাবাঁকা এই গলিটার মধ্যে যখন গ্যাসের আলো জ্ব'লে ওঠে আর তার ওপরকার ধোঁয়া ও অন্ধকারে কালো আকাশে কুয়াসাচ্ছন্ন আলোর মত তারাগুলো

কাঁপতে থাকে, তখন তার চেহারাটা যেন আরো অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে; আশেপাশের গলির অন্ধকারে যে দুর্দমনীয় পাশববৃত্তিগুলো দিনের আলোয় মুখ লুকিয়ে থাকে, রাতের বেলায় বিবর্ণ গ্যাসের আলোতে তারা যেন সব গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে; চোখে মুখে তখন তাদের গুপ্ত ছোরার ঝলক দেখা যায়।

রাতের বেলায় হঠাৎ হয়তো চীনেপাড়ায় গুলির আওয়াজ শোনা যায়, বদ্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায় তাজা বারুদের গন্ধ। খুদে-চোখ, শান্ত-দর্শন কোনো চীনেম্যান তার শত্রুকে প্রকাশ্যেই গুলি মেরে পালিয়ে গেছে। রাস্তার ওপরে শোণিতসিক্ত মৃতদেহটাকে ঘিরে চীনেরা সব জটলা পাকায়।

কিংবা কোনো দোসাদ হয়তো তার শুয়োর-কাটার ছোরাটাকে আমূল কারো পিঠে বসিয়ে দেয়। প্রতিশোধ। প্রস্রাবের দুর্গন্ধে পীড়িত দু'পাশের নোনা-ধরা দেওয়ালের গায়ে একটা তীক্ষ্ণ ও আচমকা আর্তনাদ ধাক্কা খেয়ে মাথা গুঁজে পড়ে। আবার ত্রস্ত পদক্ষেপ, জটলা, কোলাহল।

"খুন! খুন!"

"কেৎনা খুন গিরা হ্যায়—বাপ্‌ রে—"

"শালা মরকে মুর্দা বন্ গিয়া হ্যায়—"

"খুনী কাঁহা গিয়া হ্যায় জী?"

"আরে বুদ্ধুকা মাফিক্ বাত ন বোল্—ক্যা খুনীকা রিপোর্টার হঁ ম্যায়?"

"আবে—ভাগ্‌—ভাগ্‌—পুলিস!"

হঠাৎ একটা মোটর ভ্যানের আওয়াজ শোনা যায়, একটা হুইসেলের শব্দ, ঘ্যাঁচ ক'রে ব্রেক কষার কর্কশ ধ্বনি।

"ব্লাডি—সোয়াইন্—"

রিভলভার হাতে মোটর ভ্যান থেকে একজন মদমত্ত সার্জেণ্ট লাফ দিয়ে নামে, তার পেছনে কয়েকটা লাল-পাগড়ী।

সার্জেণ্টটি বিড়বিড় ক'রে ইংরাজী ভাষায় গাল দিয়ে বলে, "ড্যাম—ব্লাডি—সোয়াইন্—" কারও উদ্দেশ্যে ঠিক নয়। বোধ হয় ওটা তার একটা অভ্যাস, বিরক্তির মুহূর্তে এই গালগুলো আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। কিংবা হয়তো হুইস্কির প্রভাব।

সার্জেণ্টের উগ্রমূর্তি দেখে জনতা স'রে যায়। পুলিসের ভারী বুটের আওয়াজ বেশ খানিকক্ষণ শোনা যায় সেখানটায়। খানিকটা জেরা চলে, কাগজের ওপরে পেন্‌সিলের লেখার খস্ খস্ শব্দ শোনা যায়। ইনভেষ্টিগেশন রিপোর্ট। তার কিছুক্ষণ পরে ফিয়ার্স লেনের স্বাভাবিক অথচ অসুস্থ জীবনের স্রোত আবার আগের মতই প্রবাহিত হতে থাকে। জলের মধ্যে যেমন দাগ পড়ে না, ফিয়ার্স লেনের মানুষের জীবনেও তেমনি কোনও দাগ পড়ে না এ সব ঘটনায়। কারণ খুনজখম, মারামারি, কাটাকাটি, আর্তনাদ ও কোলাহল সেখানে আকস্মিক নয়—নিত্যনৈমিত্তিক। অশ্লীল গালিগালাজ, চীৎকার, অট্টহাসি আর রক্তই যেন ফিয়ার্স লেনের সুস্থতার পরিচয় দেয়। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই যেন অস্বাভাবিক আর সন্দেহজনক মনে হয়।

এই সব পরিবেশের মধ্যেই বিচ্ছিন্নভাবে আছে অনেকগুলো হিন্দু-বাড়ি। অধিকাংশই সুবর্ণবণিকদের। প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী তারা, বড় বড় ব্যবসা আর সম্পত্তির মালিক, পুরুষানুক্রমে ধনের পরিমাণ তাদের ক্রমেই স্ফীতিলাভ করছে। বড় বড় বাড়ি, অসংখ্য কক্ষ তাতে, মহার্ঘ আসবাবপত্রে ভরপুর, সুসজ্জিত। বহুদিনের

বাসিন্দা তারা, তাদের অট্টালিকাগুলোর প্রাচীন অথচ অভিজাত আকৃতি দেখলেই সে কথা বোঝা যায়। বড় বড় বাড়ি কিন্তু লোকজন বেশি নেই, অনেক ঘর খালি প'ড়ে থাকে, অব্যবহারের ভ্যাপসা দুর্গন্ধের মাঝে মাকড়সারা জাল বোনে এখানে ওখানে। পাউডারের মত মিহি ধুলো জমে ঘরময়। নিজের নিজের বাড়িতে এক-একটা বিচ্ছিন্ন পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে এরা বিভোর হয়ে থাকে। এরা দেবদ্বিজে বিশ্বাস করে, নিজেদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে ধূপ দীপ জ্বালায়, পট্টবস্ত্র প'রে বিগ্রহকে প্রণাম করে; কিন্তু কেউ কারো খোঁজখবর নেয় না, কেউ কারো ধার ধারে না, দেউড়িতে ভিখিরী এলে এক মুঠো চাল দিতে এদের বুকে বাজে। মহানগরীর স্বার্থপরতা ও নোংরা গলির সংকীর্ণতার বিষ তাদের রক্তে সংক্রামিত হয়েছে এবং সেখান থেকে চোরাগলি বেয়ে চেতনাকেও আচ্ছন্ন করেছে।

পঁচিশ বছর ধ'রে আজমল এই গলিতে আছে। যুক্তপ্রদেশের ফৈজাবাদে তার বাড়ি। কুড়ি-পঁচিশ টাকা সম্বল নিয়ে এককালে সে কলকাতায় এসেছিল, ফিরি ক'রে বেড়াত দশ-পনেরো টাকার মনিহারী জিনিস—তেল, আলতা, ছুঁচ, সুতো, পেন্সিল, লজেন্স। সে এক প্রচণ্ড সংগ্রামের দিন গেছে। কিন্তু হার মানার মত দুর্বলতা ছিল না তার। সেই নগণ্য অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সে ওপরে উঠেছে। মাথার চুলে যখন তার পাক ধরল তখন সে এক দোকান করল। ফিয়ার্স লেন থেকে যে সব গলি বেরিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউতে পড়েছে, তারই

একটার মোড়ে তার দোকান এবং আজ তাতে অন্তত দশ হাজার টাকার মাল আছে। আল্লা তাকে তার সংগ্রামের পুরস্কার দিয়েছেন।

দোকানের উপরতলায় থাকে আজমল। বউ, দু মেয়ে, ছেলে, ছেলের বউ। স্বচ্ছল সংসারের শান্তি ও তৃপ্তির মাঝে আল্লার নাম নিয়ে গড়গড়া টানে আজমল। আরব্যোপন্যাসের রাজ্যহীন রাজপুত্রের মত তার সুদর্শন ছেলে হোসেন। ছেলের বউ যেন বেহেস্তের হুরী, তার কোলে এক অপরূপ শিশু। দুনিয়ার সেরা দৌলৎমন্দ্‌কেও আজমলের সৌভাগ্যের কাছে হার মানতে হবে।

আর সবাইকে ভালবাসে আজমল। পাঁচ বছর আগে হজ ক'রে ফিরে এসেছে সে। লোনা জলের সমুদ্র পেরিয়ে, দেহের লোনা জল অনেক ঝরিয়ে সে আল্লার দরবারে গিয়ে হাজিরা দিয়ে এসেছে। তার মনে পাপ নেই আর, নেই কোনো ঘৃণা। সে মুসলমান, তার জন্য সে গর্বিত, উন্নতশির। সে মুসলমান, তাই সে সব মুসলমানদের ভালবাসে। শুধু তাই নয়, মুসলমান ব'লেই সে সব জাতকেই ভালবাসে। সে জানে যে আল্লার দুনিয়ায় মুসলমানদের মত আর সকলেই আল্লার সন্তান।

কিছুদিন ধ'রে হোসেন গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

মুসলিম-লীগ প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম ঘোষণা করেছে।

আজমল ছেলেকে প্রশ্ন করল, "কিন্তু এ লড়াই কার বিরুদ্ধে?"

গম্ভীরমুখে হোসেন জবাব দিল, "যারা আমাদের পাকিস্তানের দাবীকে স্বীকার করছে না।"

"কারা কারা?"

"ইংরেজ, কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা।"

"তার মানে ইংরেজ এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে?"

"ইংরেজ তো বটেই। তবে কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নয়, কেবল হিন্দু দলগুলির বিরুদ্ধে।"

"তবে এতদিন ইংরেজ এবং এদের সঙ্গে লড়াই কর নি কেন? অনেকদিন ধ'রেই তো ওরা পাকিস্তান-দাবীকে মানছে না।"

বাপের জেরায় হোসেন মৃদু হাসল, বলল, "সব কাজেরই একটা বিশেষ মুহূর্ত আছে আব্বাজান।"

আজমলের মুখে কোথাও বিশ্বাসের ছায়া নেই, সে মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু সে মুহূর্ত আজ এল কেন? আজ ইংরেজরা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে দিতে যখন রাজী হয়েছে, তখন এই লড়াই ক'রে কি লাভ?"

হাসিমুখেই হোসেন বলল, "এই তো মওকা আব্বাজান—ঝোপ বুঝে কোপ দেওয়াই তো রাজনীতি। একজনের নয়, অনেকের স্বার্থচিন্তাকেই রাজনীতি বলে।"

"তা হ'লে এ লড়াই আসলে হিন্দুদের সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, যদি তারা পাকিস্তান না মানে?

"কিন্তু তাদের সঙ্গে লড়াই ক'রেই কি আমরা পাকিস্তান পাব?"

"মিটে গেলেও যে তারা তা দেবে না, তা তো প্রমাণিত হয়ে গেছে।"

"তার মানে, এখন দাঙ্গা করতে হবে? খুন চালাতে হবে?" আজমল হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল।

হোসেন কোনও জবাব দিল না, অর্ডার-বুকের পাতাগুলোকে বারংবার সে শুধু উলটে পালটে দেখতে লাগল।

ব্যাকুলভাবে বলল আজমল, আবেগে কণ্ঠস্বর তার কেঁপে উঠল কয়েকবার, "কিন্তু আর কোনও উপায় কি নেই? হিন্দু মুসলমান এতদিন একসাথে আছে, বরাবর কি তেমনি থাকতে পারে না? একসঙ্গে কি আজাদীর হিস্‌সা নেওয়া যায় না?"

হোসেন উদ্ধতের মত মাথা নাড়ল, "না, তা আর হয় না, হ'লেও তাতে মুসলমানের সুখ নেই।"

আজমলের কথা তার গলাতেই আটকে গেল, সে আর কিছুই বলল না, কেবল নিঃশব্দে সে মুখটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। জমানা বদলে যাচ্ছে, মানুষ খোদার কাছ থেকে ক্রমেই দূরে—অতি দূরে স'রে যাচ্ছে। ঔদার্য, পরমতসহিষ্ণুতা ও মহৎ আকাঙ্ক্ষা কর্পূরের মত উড়ে গেছে। শক্তিমদমত্ত ক্ষমতা-লোভী নেতাদের গরম গরম কথায় ব্যক্তিত্বহীন জনসাধারণ আজ বিভ্রান্ত, বিপথে পরিচালিত।

হঠাৎ আজমলের মনটা সবার ওপর বিরূপ হয়ে উঠল। রাজনীতি! আজকালকার রাজনীতি কয়েকজন নেতার মর্যাদা-বৃদ্ধি ও রক্ষার ব্যাপার। হজ ক'রে তার আর ফিরে না আসলেই ভাল হ'ত। স্বার্থ আর হিংসা ছাড়া আজকালকার মানুষ আর কিছুই জানে না।

মনটা খারাপ হয়ে যায় বুড়ো আজমলের। ছড়িটা নিয়ে সে এগোল। দোস্ত রসিরুদ্দিনের কাছে গেলে হয়তো খানিকটা শান্তি পাওয়া যাবে, এই উত্তেজক দুশ্চিন্তা থেকে হয়তো খানিকটা মুক্তি পাওয়া যাবে কিংবা

এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবকে দমন করার কোন উপায় ভাবা যাবে।

দর্জির দোকান আছে বসিরুদ্দিনের। ছোট কামরাটির মধ্যে তার তিনটে মেশিন, পাঁচটা লোক, কাজ ক'রে সেরে উঠতে পারে না বসিরুদ্দিন।

একটা শেরওয়ানীর কাপড় কাটছিল সে, আজমলকে দেখে তা এক পাশে ঠেলে দিয়ে হেসে ডাকলে, "আও দোস্ত্, তস্‌রীফ লাও।"

বসল আজমল।

"লেও, পান খাও।"

"না ভাই।"

বসিরুদ্দিন নিজের মুখেই পুরে দিল খিলিটা।

"বসির!"—হঠাৎ ডাকল আজমল।

"হাঁ জী?"

"লীগের ব্যাপার জানো?"

"জানি কিছুটা।"—বসিরুদ্দিন মাথা নাড়ল।

"কি ব্যাপার বল তো? কি করবে ওরা?"

আজমলের কণ্ঠে যে উদ্বেগ লুকানো ছিল তা যেন ধরা পড়ল বসিরুদ্দিনের কাছে। সে হাসল, এগিয়ে এসে আজমলের পিঠে একবার হাত রেখে সে বলল, "ওসব ভেবে দিমাগকে খারাপ ক'রো না ইয়ার। জমানা বদলে গেছে, আজকালকার নওজোয়ানদের খুন আরবী ঘোড়ার মত বেচাল, জবরদস্ত—ওদের তুমি বোঝাতে পারবে না। তার চেয়ে এস, এক হাত সৎরঞ্চ খেলি—"

"তাই ভাল, তাই ভাল।"—সাগ্রহে মাথা নাড়ল আজমল।

খেলার কথায় সে উৎসাহিত হয়ে উঠল, যেন সব কিছু সাময়িকভাবে ভুলবার উপযুক্ত একটা কাজ পেল সে।

আজমলের বাড়ির দক্ষিণ দিকে, আরো চার-পাঁচ ঘর মুসলমান বাসিন্দার পরে বিশ্বনাথ পাইনের দোতলা বাড়ি। তার পাশেই গুরুসদয় বড়ালের বাড়ি, সেটাও দোতলা। দুটো বাড়িই প্রাচীন, দুটোর গায়েতেই বনেদী আভিজাত্যের ছাপ। তবে একটা জীবন্ত আর একটা গতায়ু। বিশ্বনাথবাবুর ক্যানিং স্ট্রীটে লোহালক্কড়ের ব্যবসা আছে, ব্যাঙ্ক আর লোহার সিন্দুকে তার যে ঐশ্বর্য সঞ্চিত আছে ও হচ্ছে তার আভাস বাড়ির গায়ের নূতন পলেস্তরা ও চুনকামের মধ্যে পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে দেউড়ীর দরোয়ানের টুলের ওপর ব'সে থাকার ভঙ্গীতে। আর গুরুসদয়বাবুর বাড়ির নোনাধরা দেওয়ালের গায়ে ফাটল ধরেছে, জমেছে পাতলা শ্যাওলার মত সবুজ একটা আস্তরণ, কার্নিশের গায়ে কবুতরেরা বাসা বেঁধে নোংরা ক'রে তুলেছে। অন্দরমহলে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার, ভারী বাতাস, দেয়ালের গায়ে বহুদিনের ধুলোর আসর। গুরুসদয়বাবু বেঁচে নেই, ছেলে অজিত এখনো উপার্জনক্ষম হয় নি। সুতরাং এখানে প্রাচুর্য নেই, প্রাণ নেই। শুধু আছে প্রাচীন কঙ্কালটা।

বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে মেয়েমহলে সোরগোল প'ড়ে গেছে। তিন দিন বাদে সুনন্দার বিয়ে। বিশ্বনাথবাবুর মেয়ে সুনন্দা।

বিয়ের কথা শুনে ইতিমধ্যেই আত্মীয়স্বজনেরা এসে পড়েছে।

এসেছে দুই মাসী, এক পিসী, এক খুড়ী ও এক মামী। স্যাকরারা দৌড়োদৌড়ি করছে, ময়রারা আনাগোনা করছে, ছুটোছুটি করছে কর্মচারী ও অভিভাবকেরা।

পাত্র বাগবাজারে থাকে। নামজাদা পরিবারের রূপবান ও গুণবান ছেলে, গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টরি ক'রে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করেছে ও করছে। এমন পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় সবাই খুশী হয়ে উঠেছে।

আর সম্বন্ধ স্থির হবে কেন? গুণবান রূপবান পাত্র কি আর দয়া ক'রে বিয়ে করছে সুনন্দাকে? তা নয়। বিশ্বনাথবাবুর সামাজিক প্রতিষ্ঠাও কম নয়। তা ছাড়া সুনন্দাও কম গুণবতী ও রূপবতী নয়। তার অসাধারণ রূপই তার সবচেয়ে বড় গুণ।

সুনন্দা কেমন দেখতে তা বিশদভাবে বর্ণনা করার দরকার কি? রক্তপদ্মের কথা স্মরণ কর, সুগন্ধি গোলাপের কথা ভাব। তা হ'লেই সুনন্দাকে কল্পনা করতে পারবে। তাকে দেখলে মনে হবে যেন বিদ্যুতের আলোতে চোখে ধাঁধা লাগল। আর তার চোখের দিকে কেউ ভুলেও চেয়ো না। অরণ্যের অন্ধকার তার চোখের তারায়—দেখে তুমি হয়তো দিশেহারা হয়ে পড়বে, ভয় পাবে, ভাববে যে তুমি স্বপ্ন দেখছ, না, সত্য দেখছ!

কিন্তু মিথ্যা নয়, সুনন্দা রূপসী, তার রূপের তুলনা নেই।

বড় মাসী সুনন্দার মাকে বলল, "গয়নাগুলো সব এসে পড়ে নি এখনো?"

"না।"

"আর ক'ভরির গয়না এখনো দেয় নি?"

"আট-দশ ভরি মাত্র দিয়েছে—এখনো তিরিশ ভরির গয়না বাকি দিদি।"

পিসী বলল, "খুকীর এমন ভাল পাত্তর হয়েছে—আমাদের কি দেবে বল তো বউদি ?"

সুনন্দার মা হাসল : "তোমায় যা দেবার তা তো অনেক আগেই দিয়েছি ঠাকুরঝি।"

"মানে ?"

"মানে ঠাকুরজামাইকে।"

"ধ্যেৎ!"

এমনি সময়ে হাস্য-পরিহাসে বাধা পড়ল। হরেন দত্তদের বাড়ি থেকে মেয়েরা এসেছে। সুনন্দাকে দেখতে।

"কই গো বউমা, খুকী কই ?"—দত্তগিন্নী ভারী শরীরটাকে নিয়ে ধপ ক'রে ব'সে বলল।

সুনন্দার মার হুঁস হ'ল। তাই তো, সুনন্দা কই ? এই তো কিছুক্ষণ আগেও সে ব'সে ছিল এখানে! তবে ? আর একটু ভাবতেই তার মাথায় যেন রক্ত চ'ড়ে গেল।

সুনন্দার ছোট মামী কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস ক'রে বলল, "একবার ছাদে গিয়ে দেখগে তো—আজকালকার মেয়ে ওদের ধরনই আলাদা।"

সুনন্দার মার যেন জ্বর এল গায়ে, দত্তগিন্নীর দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি টেনে সে বলল, "যাচ্ছি দিদি, সুনন্দাকে ডেকে আসছি।"

সত্যি তাই। আজকালকার মেয়ে ব'লেই হয়তো হৃদয়টাকে বড় ব'লে মানতে বেশি ক'রে শিখেছে। নইলে তিন দিন বাদে যার রূপবান গুণবান ও অর্থবান পাত্রের সঙ্গে বিয়ে, সেই সুনন্দা আজও কেন সন্ধ্যার

একটু আগে ছাদে যাবে? গুরুসদয়বাবুদের ছাদের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকবে, কেন তার চোখের ওপর জলের পরদা কাঁপবে থর থর ক'রে?

সুনন্দা মরেছে। গুরুসদয়বাবুর ছেলে অজিতকে সে মনে মনে ভালবেসেছে।

সেই ছোটবেলা থেকে পরিচয়। প্রতিদিন দেখেছে সে অজিতকে। প্রতিদিন দেখেছে আর তিল তিল ক'রে মনকে দিয়েছে। ভালবাসার তো যুক্তি নেই, দাঁড়িপাল্লা নেই অর্থ আর প্রতিষ্ঠা যাচাই করার জন্য, ভাল লাগাতেই তার বিকাশ। কি করবে সুনন্দা? তার বাপ-মা যতই তাকে তিরস্কার করুক গরীবের ছেলের জন্য মাথা খারাপ করায়, সে আর নিজেকে বদলাতে পারছে না। শাসানি বকুনিতেও তার ভালবাসা মরে নি।

কিন্তু কি লাভ এই ভালবেসে? বহুদিন ভেবেছে অজিত। প্রগল্‌ভতাকে সে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়, তার উচ্ছ্বাসহীন জীবনদর্শন তাকে ভাবাবেগের স্রোতে কোনদিনই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না। তাই সে বহুদিন মনে মনে প্রশ্ন করেছে—সুনন্দার এই ভালবাসায় তার কি লাভ?

অজিতের এই নীরব প্রশ্নের পেছনে যুক্তি আছে। সুনন্দা ভীরু, ভালবেসেই সে নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়, তার বেশি এগোবার মত দুঃসাহস সে কল্পনাও করতে পারে না। এর অবশ্যম্ভাবী বিয়োগান্ত পরিণতিটাকে সে আঁচ করতেও পারে, তবু তার হাত থেকে রেহাই পাবার মত, বিদ্রোহ ঘোষণা করার মত তেজ তার মধ্যে নেই।

ছাদের ওপরে, আলিসার ধারে সুনন্দা ব'সে ছিল। আর সাত-আট হাত পরেই অজিতদের ছাদ। মাথার ওপরকার শ্রাবণাকাশে মেঘ আছে, কিন্তু তাতে বর্ষণের ঘোষণা নেই। ওদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, রক্ত ছড়িয়েছে সে আকাশের গায়ে; শুকনো মেঘের চূড়োয়।

ও-ছাদের উপর অজিত এসে দাঁড়িয়েছে। ছিপছিপে, গৌরবর্ণ চেহারা, মাথার চুলে একটু কোঁকড়ানো ভাব, চোখে চশমা, পরনে খদ্দর। পূর্বপুরুষের অর্থ ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, ধূলিমলিন দেয়ালের গায়ে তাদের যে সব তৈলচিত্র এখনো বিলম্বিত আছে তাতে সেই ঐশ্বর্যের দম্ভ ফুটে আছে, ফুটে আছে একটা অসুস্থ ও বিকৃত ভঙ্গী। কিন্তু আজ অর্থ নেই, আছে সুস্থতা, আছে স্বাভাবিকতার ছাপ অজিতের মুখে চোখে।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সুনন্দার বুক ফেটে যাচ্ছিল বইকি। সে ভাবছিল, কেমন ক'রে সে ভবিষ্যতের দিনগুলোকে কাটাবে!

অজিতের বেদনা বোধ হচ্ছিল। কিন্তু তার বেশি নয়। ভবিষ্যতের কথা সে ভাবছিল না। কি হবে তা ভেবে? জীবন ছোট ব্যাপার নয়, বিস্তীর্ণ তার কর্মক্ষেত্র, নানা জটিলতায়, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তা ভরপুর, অতএব ভাববার কি আছে! একটি দুর্বল মেয়েকে ভালবেসে না পাওয়ার দুঃখ কোনদিনই বড় হয়ে থাকবে না।

তবু আজকের বেদনা সত্য, নিদারুণ সত্য।

"সুনন্দা!"

সুনন্দা তাকাল, চোখে তার জোয়ার এসেছে।

"রূপবান, গুণবান আর অর্থবান স্বামী পাবে—দুঃখ ক'রো না।"

সুনন্দা জবাব দিল না, কেবল একবার সে কেঁপে উঠল, জোয়ারের জল এবার উপচে পড়ল তার চোখের কিনারায়।

"কাঁদছ কেন সুনন্দা? সব কিছুকে অমান্য করার সাহস নেই তোমার, তাই তোমার সাধ মিটল না। এর জন্য আর কেউ দায়ী নয়। আমার কথা বলবে? আমি তো তোমাকে চাই-ই; কিন্তু আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসার মত দুর্জয় সাহস তোমার কোথায়? আমি হাত বাড়িয়ে দিলেও তো কোন ফল হবে না—না, এর জন্য তুমিই দায়ী সুনন্দা, আর তুমিই দায়ী ব'লে কান্নাটা তোমার সাজে না।"

ভেঙে পড়ল সুনন্দা, যেন দুরন্ত ঝড়ে মালতীলতা ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ছে।

"উঃ—অজিতদা—থামো—থামো—"

"কেন?"

"তুমি কি আর অন্য কথা বলতে পার না, জান না?"

"কি কথা বলব সুনন্দা?" অজিত ম্লান হাসল, চোখের তারায় তার কাঠিন্য দেখা গেল, দেখা গেল পুঞ্জীভূত আগুনকে, "তোমার মত কথা বলব, তোমার মত কাঁদব? না সুনন্দা, তা আমি পারব না, পারি না। আজ হঠাৎ যেন নিষ্কৃতি বোধ করছি আমি, ভাবছি এই ভাল হ'ল।"

"কেন? কেন?"

"আর বেশিদিন এই উত্তেজনাকে আমি সইতে পারতাম না, অনন্তকাল ধ'রে আশা করতে পারতাম না। তার চেয়ে এই ভাল হ'ল—নিষ্পত্তি হয়ে গেল, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থামল।"

"সুনন্দা!"—তীব্রকণ্ঠের তিরস্কার ধ্বনিত হ'ল।

মা! সুনন্দা উঠে দাঁড়াল, একবার তাকাল অজিতের দিকে, আর একবার জোয়ারের জল গড়াল তার চোখের কিনারা বেয়ে, তারপরে সে দ্রুতপদে মায়ের দিকে চ'লে গেল।

অবরুদ্ধ গর্জনে মা ফেটে প'ড়ে বলল, "কালামুখী, তোর কি এখনো চৈতন্য হবে না—বুদ্ধি হবে না? কর্তার নিষেধ কি তোর মনে নেই? ওই হতভাগা বাউণ্ডুলেটার মধ্যে তুই কি খুঁজে পেলি যে, বিয়ের তিন দিন আগে ওর সঙ্গে কথা ব'লে আমাদের নাম ডোবাবি? আর চোখে জল কেন? ও কি অমঙ্গুলে ব্যাপার—ছিঃ, চোখ মোছ্—"

অজিতের কানে সব কথাই গেল। সব কথাই তার কানে যাক—এমনি উদ্দেশ্যই ছিল সুনন্দার মার।

অজিত হাসল। পুরানো ব্যাপার। পৃথিবীতে তার মত অবস্থা বহু পুরুষেরই হয়েছে—এটাই একমাত্র সান্ত্বনা। থাক্ ওসব কথা। ও অধ্যায়কে স্মরণ ক'রে আর লাভ নেই। তার চেয়ে আকাশের দিকে তাকানো ভাল। মহানগরীর আকাশে এখন পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া জমা হচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ হালকা মেঘ, ছড়ানো রয়েছে অস্তগামী সূর্যের অজস্র রক্ত, আর উড়ে যাচ্ছে নীড়গামী পাখীরা দূর থেকে দূরান্তরে।

রাত দশটার সময় গলি দিয়ে একটা ট্রাক চ'লে যাচ্ছিল। তার সামনে একটা মুসলিম লীগের পতাকা উড়ছে। ট্রাকের মাঝে ব'সে ও দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারো জন লোক। একজনের হাতে একটা চোঙ।

"মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ— !" লোকগুলো ধ্বনি তুলল।

পথচারীরা স্থির হয়ে দাঁড়াল। দু'পাশের দোকানে ও বাড়িঘরের বাইরে যারা ছিল তারা সবাই উৎসুক হয়ে উঠল। দোতলা তেতলার বারান্দায় পুরুষদের দেখা গেল, চিকের আড়ালে মেয়েদের জারির ওড়না ঝল্‌সে উঠল। পান-বিড়ির দোকানের আর হোটেলের লোকগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মত গাড়িটার কাছে এগিয়ে এল।

"কায়েদ-এ-আজম জিন্দাবাদ— !" আবার ধ্বনি উঠল।

দর্শকেরাও এবার প্রতিধ্বনি তুলল, "কায়েদ-এ-আজম জিন্দাবাদ !"

"হিন্দু কংগ্রেস মুর্দাবাদ—"

আবার প্রতিধ্বনি উঠল।

চোঙাধারী লোকটি তাতে মুখ লাগিয়ে বলতে শুরু করল, "মুসলিমন ভাইয়োঁ—আমাদের লড়াইয়ের দিন এসেছে। বহুৎ আরজি, বহুৎ মিন্নৎ ক'রেও আমরা কাজ হাসিল করতে পারি নি। ব্রিটিশেরা আর বানিয়া কংগ্রেস আমাদের পাকিস্তান দাবীকে উপহাস করেছে। কিন্তু আর সইব না আমরা। একদিন আমরা বাদশাহ হয়ে এসেছিলাম এ দেশে, তাই আজ আর আমরা ভিখমাংগা হয়ে থাকব না কারো কাছে। মুসলিমন ভাইয়োঁ, আজ কোরবানী দেবার ব্‌খ্‌ত এসেছে—আজ হমারি কসম্‌ ইয়েহ হ্যায় কি হম্‌ পাকিস্তান লেঙ্গে আওর লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান—"

ধ্বনি উঠিল, "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান—"

হিন্দু বাড়িগুলোর জানলার গোড়ায় যাদের দেখা গেল তাদের মুখমণ্ডল আশঙ্কায় পাণ্ডুর। কি হবে? আবার কি দাঙ্গা বাধবে?

ট্রাকটা এগিয়ে গেল, তার শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল। রাস্তার লোকেরা উত্তেজিতভাবে কি সব যেন বলাবলি করতে লাগল।

পাড়ার চীনে মিস্ত্রী লিনটিংএর দোকানে একটা ভাঙা চীনে রেকর্ড বেজে চলেছে। তারই আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল।

হঠাৎ সে শব্দ ছাপিয়ে আর একটা শব্দ শোনা গেল।

খট্ খট্ খট্ খট্। জন কুড়ি লোকের পদধ্বনি।

মুসলিম লীগ ভলান্টিয়াররা। যুদ্ধের সৈনিকের মত সামনের দিকে তাদের দৃষ্টি। শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা সবাই মহম্মদ আলি পার্কের দিকে চলেছে।

খট্ খট্ খট্ খট্।

তালে তালে পা ফেলে ওরা চ'লে গেল।

আজমল সবই দেখল। হ্যাঁ, বসিরুদ্দিনের কথাই ঠিক, আরবী ঘোড়ার মতই জবরদস্ত ওদের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত, ওদের বাধা দেবে কে?

সে গিয়ে কোরাণ-শরীফ খুলে বসল। রোজই মাঝরাতে সে তাই পড়ে। তখন এই ফিয়ার্স লেনে খানিকটা নিঃশব্দতা নেমে আসে। হয়তো কোনো মদমত্তের বা চীনা গণিকার চীৎকার মাঝে মাঝে ভেসে আসে কিংবা লিনটিংএর চীনা রেকর্ডের বিশ্রী আওয়াজ আর হয়তো মাঝে মাঝে কোনো একদিন আচম্‌কা একটা আর্তনাদ ও কোলাহল। কিন্তু সে সব দিকে কান থাকে না, নজর থাকে না আজমলের। এমন কি জানলা দিয়ে যে নক্ষত্র-খচিত আকাশটাকে দেখা যায়, তার কথাও মনে থাকে না তার। কোরাণ-শরীফের পাতা খুলে সে আল্লার সামনে মুখোমুখি হয়ে বসে আর বলে, 'মেহেরবান খোদা, তোমার রহম যেন সবার উপর বর্ষিত হয়, হে করিম, তুমি সকলের মঙ্গল কর।'

ছোট মেয়ে রোশানারা তার সেলাইয়ের কাঁচিটা তাকে শাণ দেবার জন্য দিয়েছে। তাই নিয়ে বেরোল আজমল।

লিনটিংএর দোকান। পুরোনো লোহালক্কড় আর টিনের স্তূপ। ঝালাই, শান দেওয়া, মেরামত করা, ছুরি কাঁটা তৈরী করা—এই তার কাজ। পরণের কালো পায়জামাটা তার বুড়ো শরীরের মতই জীর্ণাকৃতি। আর গায়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জী। দু'-একগাছা রোমের মাঝে তার গোঁফ আর দাড়িকে অতিকষ্টে চিনে নিতে হয়; মমির মুখের মত অসংখ্য বলিচিহ্নাঙ্কিত তার জরা-জর্জর মুখমণ্ডল, চামড়ার ভাঁজে আর ঝুলে-পড়া ভুরুর নীচে তার খুদে খুদে চোখ দুটো প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কাঁচিটা নেড়ে চেড়ে লিনটিং বলল, "এক লুপি।"

আজমল হাসল, তিরস্কার করার ভঙ্গীতে বলল, "লিনটিং!"

লিনটিংও ফিক ক'রে হেসে ফেলল, তার ফোগ্‌লা দাঁতের আড়ালে জিভটাকে নড়তে দেখা গেল, দ্রুতকণ্ঠে নিজেকে শুধরে সে বলল, "আচ্চা, আচ্চা, গিভ আট আনা মিঞা।"

"আচ্ছা, কাজ সুরু করো তো।"

কাঠের যন্ত্রটার নীচে একটা প্যাড্‌লের মত আছে, সেটাকে পা দিয়ে নাড়তেই ওপরকার চাকাটা দ্রুতবেগে আবর্তিত হতে লাগল আর কাঁচির সংস্পর্শে তারাবাজির মত আগুনের ফুলকি সামনের দিকে উড়ে যেতে লাগল।

"গানা শুনোগে মিঞা—চীনা রেকর্ড?"

"নেহি।"

হঠাৎ আজমলের নজর পড়ল ঘরের এক কোণে। দুটো তলোয়ার ও গোটা চারেক ছোরা শান দেওয়া হয়েছে, একটা পাশব দীপ্তিতে

সেগুলো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। অনেক অনর্থ আর রক্তপাতের সংকেত মাখানো ওদের ধারালো ফলাগুলো আজমলকে হঠাৎ শঙ্কিত ক'রে তুলল।

"লিনটিং!"

"ইয়েস।"

"ওসব ছোরা আর তলোয়ার কার?"

"মেরা কাস্টমারকো।"

"কে সে?"

"তাজ মহম্মদ।"

চিনতে পারল আজমল। চর্ম-ব্যবসায়ী শেখ ইফ্‌তিকারের কর্মচারী, পেশোয়ারী যুবক। ভারী উদ্ধত, ভারী বদরাগী।

"হঠাৎ একসঙ্গে এতগুলোকে কেন ধার দিচ্ছে লিনটিং?"

লিনটিং হাসল না, গম্ভীর মুখে কাঁচিটাতে শান দিতে দিতে একবার মাথা নাড়ল, তারপরে বলল, "গানা শুনোগে মিঞা—চীনা রেকর্ড?"

রোজা ভেঙে, সবে খাওয়া শেষ ক'রে বারান্দায় গিয়ে বসেছে আজমল। বাচ্চা চাকরটা এক কোণে ব'সে গড়গড়া সাজছে। এমনি সময়ে পাশের বাড়ির জানলাটা খুলে গেল। পাশের বাড়ির পরেশবাবু তাকে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে।

"আজমল ভাই, ও ভাই আজমল—"

পরেশ আজমলের সমবয়সী, বাড়ির নীচেই তার সোনারূপোর দোকান আছে। সেও এই গলিতে বহু বছর ধ'রে আছে। আজমলের সঙ্গে তার বহুদিনের পরিচয়।

"কি খবর পরেশ ?"

"আর দু'দিন বাদেই তো ষোলোই আগস্ট, তখন কি হবে ভাই ?"

"কি হবে তা খোদাই জানেন। তবে ঘাবড়াবার মত তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—কি আবার হবে ? অন্যান্য পার্টির মত লীগও হয়তো আইন অমান্য করবে।"

পরেশ গলার স্বর নামিয়ে বলল, "কিন্তু সবাই ভাবছে যে, দাঙ্গা হবে !"

বেশ বোঝা গেল যে, সে ভয় পেয়েছে, রাস্তার গ্যাসের আলোতে তার অর্ধালোকিত মুখমণ্ডলে আতঙ্কের ছায়াটা পরিষ্কার দেখা গেল।

আজমল সবেগে মাথা নাড়ল, "তোবা—তোবা ! ভাই ভাই লড়াই করবে ? না, না, ওসব ঝুট বাত।"

কথাটা যেন বিশ্বাস হ'ল না পরেশের, শুষ্ককণ্ঠে সে বলল, "ঝুটা হ'লেই ভাল। কিন্তু একটা কথা ভাই, একটা আরজি—"

"বেশ—বল—"

"যদি কোনো বিপদ হয়, আমাদের সাহায্য ক'রো ভাই।"

আজমল সবেগে উঠে দাঁড়াল, বারান্দার প্রান্তে এগিয়ে এসে সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "দোস্ত, সাচ্চা মুসলমান কখনো বেকসুর লোকের অপকার করে না, তা ছাড়া, তুমি আমার দোস্ত, আমার পড়োশী, আমার ভাই। পরেশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

আড়াই বছর পরে আকবর সেই বহু-পরিচিত গলিতে পা দিল। ফিয়ার্স লেন, হ্যাঁ, তাই বটে। গলিটার একটুও পরিবর্তন হয় নি, তবে লোকজনের ভিড় বেড়েছে। অপরিচিত লোকজনের ভিড়। না, ফিয়ার্স লেনই বটে। অথচ কাল, ঠিক এই সময়ে? জেলখানার উঁচু দেয়াল, লোহার ফটক, শান্ত্রী লছমণ সিংয়ের হাতের বন্দুক। আড়াই বছর পর সে ফিরে এল। আড়াই বছরে কত দিন, কত মুহূর্ত! কত পরিবর্তন ঘটেছে এর মাঝে। ফিয়ার্স লেনের বাড়িঘরগুলো একই আছে বটে, কিন্তু তবু পৃথিবীতে একটা পরিবর্তন হয়েছে বইকি। যুদ্ধের সময় জেলে গিয়েছিল আকবর, আজ তা কোথায়? কোথায় সেই সব ট্রেঞ্চ্ আর দেয়াল, ব্ল্যাক্‌আউটের শেড আর খাকীর রাজ্য? সত্যি, পৃথিবীটা বদলেছে।

এইবারকার আড়াই বছর মিলিয়ে তার সবশুদ্ধ ন' বছর জেল খাটা হ'ল। মনে মনে হিসেব করে আকবর। একজনের নাক ফাটিয়ে তিন মাস, একজনের টাকা কেড়ে দেড় বছর, একজনকে ছোরা মেরে চার বছর, জুয়া খেলে আট মাস আর বাঈজী গহরজানকে ছোরা মেরে তার গয়না কেড়ে নেবার চেষ্টা করায় এই আড়াই বছর।

জেলার সাহেবের কথা মনে পড়ল। তাকে 'পুরানা পাপী' ব'লে ডাকতেন তিনি। আকবর মাথা নাড়ল। সত্যি সে তাই। বেশিদিন সে সুস্থ থাকতে পারে না, একটা কিছু ক'রে জেলখানায় না গেলে তার মনে যেন শান্তিই আসে না। অথচ তার বয়স তো দিন দিন বাড়ছেই। পঁয়ত্রিশের কোঠা পার হয়েছে তার বয়েস, কানের পার্শ্ববর্তী দু-একটা চুলে সাদা রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে, মনের ভেতর খানিকটা ঠাণ্ডা আমেজ ঘনিয়ে এসেছে। শরীরটা একটু রোগা হয়েছে, ছ'ফিট

উঁচু সুগৌর দেহটা ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। আর সব ঠিক আছে। নীচের ঠোঁটের কোণে সেই কাটা দাগটা, সেই পুরোনো লুঙ্গি, মলমলের কলিদার পাঞ্জাবি আর তৈলহীন কোঁকড়ানো চুল। আর সব ঠিক আছে, কিন্তু পরিবর্তনও কম হয় নি। না, এবার থেকে আকবর ভিন্ন রাস্তা দিয়ে চলবে, বাকী জীবনটা সে শান্ত ও সহজভাবে কাটাবে, সংসার করবে।

একটা পানের দোকানের সামনে সে থামল। পকেট থেকে মনিব্যাগটা বের করল। চোদ্দ আনা পয়সা। আড়াই বছর আগে যা ছিল, ঠিক তাই আছে। জেলার সাহেব লোক ভাল।

"এক প্যাকেট সিগারেট লাও তো ভাইয়া।"

দোকানদার সিগারেট দিতে গিয়ে একটু চমকে উঠল। ফিয়ার্স লেনের নামী গুণ্ডাকে সে চেনে বইকি।

"মিঞাসাব্, আপ্ মৌলানা আকবর হ্যায় না?"

"হাঁ, উসে ক্যা?"

"জী, কুছ নেহি।"

"আচ্ছা, সিগারেট লাও—"

সিগারেট টানতে টানতে চলল আকবর। আঃ, সিগারেটটা ভারি মিষ্টি লাগছে। চারদিকে তাকাল সে। পানের দোকানে ও অন্যান্য দোকানের দেয়ালে জিন্না সাহেবের বহু প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। ভাল। কোথায় যাওয়া যায়? দূর, এত ভেবে কি হবে? বাড়িতেই যাবে সে। বুড়ো বাপ আছে—হয়তো এখনো হাইকোর্টে দপ্তরীর কাজ করে। বাপ তার ওপর নারাজ, কিন্তু কি করবে সে? ছোট ভাই আবদুল আছে, ভারি অহঙ্কারী ছেলেটা। সেও সরকারী চাকরি করে

কিনা তাই। আর—আর খাতুনা। খাতুনার কথা তার এতক্ষণ পর্যন্ত মনে পড়ে নি, আশ্চর্য! তার নাকি একটি মরদ বাচ্চা হয়েছে। বছর দুয়েক আগে দেখা করতে গিয়ে আবদুল ব'লে এসেছিল, বাবাও বছর খানেক আগে বলেছিল বাচ্চাটার বড় হওয়ার কথা। কিন্তু তারপর আর কেউ তার কাছে যায় নি। বোধ হয় তার বিষয়ে কারো আর কোনো কৌতূহল নেই, তাকে আর কেউই এ সংসারে চায় না। খাতুনা—সেও কি তাই? ভাবতে কষ্ট হয়, একটু জ্বালা ধরে মনে।

একটা নোংরা অন্ধ গলির অন্ধকারে আকবর প্রবেশ করল। মিনিট দুয়েক হাঁটবার পর আকবর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কান পেতে প্রথমে সে ভেতরের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করল। যদি বাবা বাড়িটা বদলে থাকে!

একটি শিশুর কান্না শোনা গেল।

"কাহেজী ভাইসাব, কাঁদিস কেন?" বাবার গলা। ঠিক, এই বাড়িই বটে।

আকবর ভেতরে ঢুকল। রান্নাঘরে কে যেন বাটনা বাটছে। ঢুকতেই শরীরটা একটু কেঁপে উঠল তার। যেন একটা আশ্চর্য পৃথিবীতে সে প্রবেশ করছে। একটু রোমাঞ্চ জাগল মনে দেহে।

উঠোনের ওপর বাবা একটি বছর দুয়েকের ছেলে কোলে ক'রে ব'সে আছে। আকবর দেখেই চিনল। খাতুনার মুখকে চেনা যায় ছেলেটাকে দেখে।

"আব্বাজান!"—সে ডাকল।

"কৌন?"

"আমি আকবর। সেলাম, আব্বাজান।"

বাবা ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল, তাকে দেখে ইব্রাহিম মিঞার চোখ দুটো একটু বড় হ'ল, পরে সে বললে, "ওঃ, বেশ, বেশ—আজকেই বুঝি ছাড়া পেলি?"

"হ্যাঁ।"

"বটে, তা ব'স্, আর এই নে তোর ছেলেকে।"

রান্নাঘরে বাটনার শব্দ থেমেছে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ভারি অস্বস্তিবোধ করল আকবর; তার দিকে ছেলেটা ভারি অবাক হয়ে তাকাল, পরে কোল থেকে নামবার চেষ্টা করতে লাগল।

ইব্রাহিম বলল, "নামিস কেন রে বাচ্চা, ও যে তোর আব্বা—নামী গুণ্ডা।" বাপের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ চাবুকের আওয়াজ তুলল।

আকবর মাথা নীচু করল। আফশোষ। এ সংসারে তাকে কেউ চায় না।

ছেলেটা জোর ক'রে কোল থেকে নেমে গিয়ে দাদুর হাত ধরল। অপরিচিতকে দেখে তার চোখে বিস্ময়, ভয় আর কৌতূহল।

ইব্রাহিম নাতির হাত ধ'রে রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

রান্নাঘরে আবার বাটনা বাটা আরম্ভ হ'ল।

আকবর ভারি অসহায় বোধ করতে লাগল। খাতুনা কোথায়? খাতুনা?

ইব্রাহিম রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"আবদুল নেই, আব্বাজান?"

"না, ও মিটিঙে গেছে।"

"কিসের মিটিং ?"

"লীগের। লীগ্‌গিরই যে আন্দোলন করবে ওরা।" ইব্রাহিমের কণ্ঠে উৎসাহ।

"ওঃ!"—নিরাসক্তভাবে আকবর বলল। এ সবের ধার ধারে না সে। রাজনীতিরও মর্ম সে বোঝে না, বোঝার তার দরকারও নেই। তবে দিনকাল একটু বদলেছে মনে হচ্ছে। রাস্তায়, সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে সে একটা চাঞ্চল্য দেখেছে, দেখেছে উত্তেজনা। মুসলমানরাও বোধ হয় হিন্দুদের মত আজাদীর জন্য লড়বে। ভালই তো।

ইব্রাহিম ছেলের দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল, পরে বলল, "তোর আসাতে আমি খুশিই হয়েছি আকবর, কিন্তু আমার এখানে থেকে আর গুণ্ডামি করা চলবে না।"

অপমানে আকবরের মুখ-চোখ আরক্ত হয়ে উঠল। দেহাভ্যন্তরের পাঠান-রক্ত মুহূর্তের জন্য উষ্ণ ও আবর্ত-সঙ্কুল হয়ে উঠল। তবু সে চুপ ক'রে রইল। কিন্তু খাতুনাকে দেখা যায় না কেন? আড়াই বছরের অদর্শনের পর বুঝি সামনে আসতে লজ্জা হচ্ছে?

"খেয়ে-দেয়ে তুই আরাম কর্ আকবর, আমি একটু বেড়িয়ে আসি।"

ইব্রাহিম টুপি মাথায় দিয়ে বেরুল।

ছেলেকে কোলে নিয়ে এতক্ষণে খাতুনা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল, কাছে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ আকবর অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করে, খাতুনাকে দেখে একটা নূতন স্পন্দন সে সারা দেহে অনুভব করে। দীর্ঘ আড়াই বছর ধ'রে সে নারীর সান্নিধ্য, নারী-দেহের স্পর্শ অনুভব করে নি। খাতুনাকে

দেখেই হঠাৎ একটা উগ্র কামনায় তার দেহমন অধীর ও ব্যগ্র হয়ে উঠল।

খাতুনা বারান্দায় চারপায়ার ওপর বসল, ওড়না দিয়ে ললাটের ঘাম একবার মুছে আকবরের দিকে তাকাল।

খাতুনা আরও সুন্দরী হয়েছে। পরিপক্ক ফলের মত তার রঙে আর ত্বকে মসৃণতার জোয়ার এসেছে। পানের রসে ভিজানো দুটো লাল ঠোঁট আর মেহেদী-লাগানো দুটো সুগোল হাত ভারি লোভনীয় হয়ে উঠেছে।

আকবর তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চকচকে নতুন ছোরার মত তার উজ্জ্বল দৃষ্টি।

"খাতুনা!"

খাতুনা পান চিবোতে চিবোতে তার দিকে তাকাল।

"ক্যায়সী হো খাতুনা?" পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যেন নতুন ক'রে নেশা জন্মেছে, নতুন আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে আকবরের মনে।

"আচ্ছি হুঁ।"—খাতুনার স্বরে কোনও আমেজ নেই।

আকবর খাতুনার একটা হাত টেনে নিল, "জেলখানায় প্রায়ই তোমার ইয়াদ হোত খাতুনা—"

খাতুনা হাসল, "তাই নাকি? তা সে তো জেলে, কিন্তু এখন তুমি মুক্ত, এখন তো তোমার অনেক আওরতের ইয়াদ হবে।" খাতুনার কণ্ঠে শ্লেষ।

কি হ'ল খাতুনার? আকবর আহত হ'ল। আড়াই বছর পরে জেল-প্রত্যাগত স্বামীকে কি এমনিভাবে সম্ভাষণ করতে হয়! সে

গুণ্ডা, কিন্তু সব সময়েই তো সে ভুল করে নি। তার পাঠান-রক্ত মাঝে মাঝে তাকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে সে নিজেকে সামলাতে পারে না, এই তার দোষ। কিন্তু সে তো ভালবাসে খাতুনাকে। খাতুনা কি কোনদিন তার প্রমাণ পায় নি, কোনদিন তা অনুভব করে নি! আর যে স্ত্রী ভালবাসে সে তো স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে গ্রাহ্য করে না। তা ছাড়া সে আর সেই পুরনো আকবর নেই। সে এবার বদলেছে। তবু কেন খাতুনা এমন কথা বলে?

আকবর খাতুনার হাত ছেড়ে দিল।

খাতুনা প্রশ্ন করল, "আব্বাজান কা বাতে তুম্‌নে শুনা তো?"

"কৌন্ বাত?"

ললাট কুঞ্চিত ক'রে খাতুনা বলল, "আর গুণ্ডামি ক'রো না—এতে আমাদের বড় বদনাম হয়—"

"ওঃ—"

অন্যমনস্কভাবে বলল আকবর। তার মাথায় বাবার আর খাতুনার কথাগুলো ঘুরে বেড়াতে লাগল। অসীম উপেক্ষা-মিশ্রিত কথাগুলো। যেন সে গুণ্ডামি করলে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হবে। খাতুনা এত বদলেছে! সেও সায় দিল! এখনও তো আবদুল বাকী। হঠাৎ বিতৃষ্ণায় আকবরের সারা চিত্ত গৃহ-বিমুখ হয়ে উঠল। নাঃ, সংসারে তাকে কেউই চায় না। শ্রদ্ধা ভালবাসা তো দূরের কথা, সহানুভূতিও কেউ করে না। সুতরাং আবার তাকে দোস্তদের আড্ডায় যেতে হবে। অন্ধকার ঘর আর গলি, মদ আর হল্লা—ওই তার জীবন।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল।

"কোথায় যাচ্ছ?"—খাতুনা প্রশ্ন করল।

"বাইরে।"

"তা তো যাবেই—আবার জাহান্নামে তো যাবেই।"—ঘৃণায় চোখ মুখ অন্ধকার ক'রে খাতুনা বলল।

আকবর সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

একটা তীব্র কামনার বিষে দেহ-মন জর্জরিত হয়ে উঠল। বহু দিনের নিঃসঙ্গতায় যা সে প্রত্যহ চেয়েছে তা আজ যেন একত্রিত হয়ে দাবি জানাচ্ছে—কোলাহল, হাসি, ঠাট্টা, মদ আর নারীদেহের কোমল স্পর্শ। বোধ হয় এই সবই আজ চাই। যদি খাতুনা তাকে বুঝত, তাকে তার বুকে আশ্রয় দিত, তা হ'লে বোধ হয় এ সব না হ'লেও চলত। কিন্তু সেদিকে নৈরাশ্য। অথচ দেহ-মনকে উপবাসী রাখা যাবে না। না, উপায় নেই। কিন্তু পয়সা? বিনা পয়সায় তো সুরা ও নারী পাওয়া যাবে না। আচ্ছা, দেখা যাক।

একটা ছোট্ট গলির মুখে সে দাঁড়াল। গ্যাসের আলোটা দূরে, যেখানে সে দাঁড়াল সেখানে বেশ খানিকটা জমাট অন্ধকার; দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ ক'রে সে দাঁড়িয়ে রইল। রাত তখন ন'টা হবে, ফিয়ার্স লেন থেকে কোলাহল ভেসে আসছে, ভেসে আসছে হাসির শব্দ।

মিনিট হু'য়েক পরই একজন বাঙালী ভদ্রলোক ঢুকল গলিতে।

আকবর তাকাল চারদিকে। কাছাকাছি কেউ নেই। আরো খানিক দূরে যাক লোকটা। সে ভদ্রলোকটির পেছনে চলতে শুরু করল। শীর্ণদেহ বাঙালীবাবু।

আরো কয়েক মুহূর্ত।

হঠাৎ পেছন থেকে লোকটির ঘাড় ধরল আকবর, ঠেলে তাকে দেয়ালে চেপে ধরল, বলল, "খবরদার—"

চেঁচাতে যাচ্ছিল লোকটি, কিন্তু থেমে গেল আকবরের জলন্ত চোখ দেখে।

"তোমার কাছে যা আছে সব দাও, নয় তো খুন ক'রে ফেলব।"—আকবর বলল। কিন্তু বলতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল সে। আগেকার আকবর সে আর নেই। কথাগুলো বলতে যেন আটকে যাচ্ছে গলার মধ্যে। লোকটার আতঙ্কিত চাউনি আর কাঁপুনি দেখে কেমন যেন ঘৃণা হ'ল নিজের ওপর।

"দিচ্ছি।"—ভদ্রলোকটি কাঁপতে কাঁপতে বলল, "যা আছে সব দিচ্ছি, কিন্তু আমায় মেরো না—দোহাই।" কেঁদে ফেলল সে, তার গালের ওপর যে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল তা আকবর পরিষ্কার দেখতে পেল।

দূর, সে আর এ সব পারবে না। হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ল সে। ভদ্রলোকটির বিবর্ণ মুখ, কম্পিত দেহ, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর ও অসহায় কাতর চাউনি তার মনকে আত্মধিক্কারে ভ'রে তুলল। মনে পড়ল বাবা আর খাতুনার কথা। মনে পড়ল ন' বছরের জেল-জীবনের কথা, মনে পড়ল বহু বিচিত্র দিনের ক্ষয়ের কথা। জেলখানায় ব'সে ব'সে কত বসন্তের দিন ও রাত্রি কেটে গেছে, কত রঙীন মুহূর্ত উড়ে গেছে, নিষ্ফলতা,

ব্যর্থতা ও ক্ষতিই শুধু জীবন-পাত্রে প'ড়ে থেকেছে। না, সে আর এ সব করবে না।

"যাও, চ'লে যাও ভাই, কিচ্ছু চাই না আমার।"—সে বলল।

ভদ্রলোকটির হাত ছেড়ে দিল, সে খানিকটা অবাক হয়েই তাকাল আকবরের দিকে,—"কিচ্ছু চাই না!"

"না, তুমি যাও। কিন্তু খবরদার কাউকে কিচ্ছু ব'লো না।"

"না বাবা, কিচ্ছু বলব না।" এক পা এক পা ক'রে পিছু হ'টে হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল ভদ্রলোক।

আকবর হাসল। তারপরে আবার ফিয়ার্স লেনে বেরিয়ে এল। একটু আত্মতৃপ্তি জাগল মনে, মন্দ লাগল না তা। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল যে, ইচ্ছে করলেই বোধ হয় ভাল হওয়া যায়।

কিন্তু তবু, একটু মদ আর একটু নারীদেহের সুকোমল স্পর্শ পেলে বোধ হয় ভাল হ'ত। খাতুনা? না।

ভাবতে লাগল আকবর। কাছাকাছি কোনো দোস্ত কি নেই? ভাবতে ভাবতে চলতে লাগল সে।

হঠাৎ তার ডান দিকের হোটেলটার দিকে নজর পড়ল। খানাপিনা চলছে ওখানে। উনুনের একধারে পরোটা, রুটি আর শিককাবাব তৈরী হচ্ছে, আর একধারে চা তৈরী হচ্ছে। চার-পাঁচটা বৈদ্যুতিক আলোতে কাচের গেলাস, আয়না আর বাসনগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে। ঝক্‌ঝক্ করছে দেয়ালের গায়ে টাঙানো মক্কা, মদিনা, কামালপাশা আর জিন্না সাহেবের ছবিগুলো। আর যারা খাচ্ছে তাদের মাঝখানকার একজন লোকের ওপরেই নজর পড়ল আকবরের। সে থমকে দাঁড়াল।

একটু ইতস্তত করল সে, তারপর ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকল, সেই লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল, তার কাঁধে একটা হাত রাখল।

"কৌন হ্যায় ?" লোকটি চমকে উঠল।

"ম্যয়।"

লোকটির চোখের তারা বড় হয়ে উঠল, হাতের গ্রাস প্লেটের ওপর প'ড়ে গেল, সে উঠে দাঁড়াল, বিড়বিড় ক'রে বলল, "আকবর !"

আকবর হাসল, "হাঁ রে শশুরা—চিনতে পাচ্ছিস না ?"

লোকটি আবার বলল, এবার উচ্চকণ্ঠে, "আকবর !"

"হ্যাঁ রে মুস্তাক।"

"সত্যি ? সত্যি রে উল্লু ?"

"হাঁ রে হারামজাদা।"

"তবে হাথ মিলা রে শয়তান।"

"মিলা হাথ ভাই বদমাস।"

"বুকে আয়—সিনাতে সিনা লাগা রে গাধ্বা।"

"ছাতিতে ছাতি মিলা রে বুদ্ধু।"

"হাঃ হাঃ হাঃ।"

"হাঃ হাঃ হাঃ।"

"চুপ। কবে ছাড়া পেলি ?"

"আজ দোস্ত—আজ।"

সকলের বিস্মিত দৃষ্টির উপর একবার নজর বুলিয়ে মুস্তাক তার সামনেকার লোকটিকে বলল, "অবাক হচ্ছ তাজ মহম্মদ, না ?"

তাজ মহম্মদ নামক লোকটি একটু ন'ড়ে বসল।

"এই আকবর—আমার সেই পুরানা দোস্ত।"

আকবরের দিকে তাকিয়ে মুস্তাক বলল, "আর এই আমার আর এক দোস্ত, আমাদের পাড়ার একজন সর্দার—তাজ মহম্মদ।"

আকবর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল তাজ মহম্মদের দিকে। তাজ মহম্মদ তার সঙ্গে করমর্দন করল।

"লে ইয়ার, বৈঠ।"—মুস্তাক একটা চেয়ার টেনে আকবরকে পাশে বসাল।

বহুদিন বাদে পুরনো সাথী পেয়ে মুস্তাক দিলদরিয়া হয়ে উঠল।

"আরে ভাই রমজান, এ বাচ্চা—"

"জী!"

"অওর এক প্লেট গোস্ত অওর রোটি লাও—জলদি।"

তাজ মহম্মদের দিকে তাকাল আকবর। দীর্ঘকায় ও সুদর্শন লোকটি। কিন্তু তার চোখের চাউনি, ঠোঁটের রেখা আর চোয়ালের গড়নে যেন কেমন একটা হিংস্রতার ইঙ্গিত।

"খবর বোলো ভাই।"—আকবর মুস্তাককে বলল।

মুস্তাক হাসল, "খবর অনেক আছে ভাই। ঠিক সময়ে এসে পড়েছিস তুই। এই দু-তিন বছরে দেশের হালচাল বদলে গেছে, আমাদের পাকিস্তান পাবার পথ পরিষ্কার হয়ে এসেছে।"

"বটে! জেলখানায় কি ওসব বোঝা যায় ভাই।"

উৎসাহিত হয়ে মুস্তাক বলল, "হ্যাঁ, মুসলমানের অদৃষ্ট আবার বদলাবে। কায়েদ-এ-আজম জিন্না সাহেব আমাদের মুক্তিপথের সন্ধান দিয়েছেন, আজ থেকে দু-দিন বাদেই আমাদের আন্দোলন সুরু হবে, তা তো জানিস বোধ হয়?"

"শুনলাম।"

"বেশ, যোগ দিতে হবে তোকে। কি বল তাজ?" মুস্তাক তাজ মহম্মদের দিকে তাকাল।

তাজ মহম্মদ মাথা নাড়ল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকাল আকবরের দিকে, বলল, "তুমি মুসলমান ব'লে গর্ব বোধ কর তো ইয়ার?"

সোজা হয়ে বসল আকবর, "জরুর।"

"তবে তার প্রমাণ দিতে হবে—দু'দিন বাদে। মুস্তাকের দোস্ত্ তুমি—ধীরে ধীরে সব জানবে, ঠিক সময়ে সব ব'লে দেওয়া হবে তোমাকে। মনে রেখো, জান পর্যন্ত কোরবানী দিতে হতে পারে।"

আকবর হাসল। নূতন জীবন সুরু হ'ল তবে। দশের মুক্তির সাধনা। ভাল, সে বাঁচল।

মাথা নেড়ে সে বলল, "দেব—তা দেব দরকার হ'লে—আমায় তোমরা সেই মহৎ ব্রতে ডেকো, নিশ্চয় ডেকো ভাই—"

হোটেল থেকে বেরিয়ে মুস্তাক বলল, "কোথায় যাবি এবার?"

আকবর হাসল, "সরাব-টরাব কি আজকাল খাস না?"

"খাই বইকি।"

"তবে চল্, সরাব খাওয়াবি।"

মুস্তাক হাসল, "চল্।"

দু-এক পা এগোতেই সে ঘুরে দাঁড়াল, "শুধু সরাবই খাবি মেরা জান্?"

"আর কি আছে?"

"আর কিছুই কি দিল চায় না?"

"চায়, তা কি পাব? হুরী-পরী কি কাছাকাছি আছে?"

"আছে, যাবি?"

মুস্তাকের কাঁধে হাত রেখে আকবর হেসে উঠল, "সাবাস ওস্তাদ, মনের কথা ঠিক ধরেছিস তুই।"

গলির আর এক প্রান্তে মেহেরুন্নিসা বিবি থাকে। মদ কিনে সেখানে গেল দুজনে।

দু-একজন লোক ছিল। মুস্তাককে দেখে তাদের সরিয়ে দিল মেহের বিবি।

হেসে ডাকল সে, "আও, তস্‌রীফ্ লাও মেরে মজহ্; লেকিন্—" আকবরের দিকে সে কটাক্ষপাত করল।

"মেরা দোস্ত্—বড়া দোস্ত্—আকবর—"

"সেলাম।"—মেহের বিবির সেলামের ভঙ্গীটি বড় মনোরম।

"সেলাম।"—আকবর হেসে বলল।

মুস্তাক দুটো মদের বোতল সামনে রাখল, বলল, "দো গেলাস লাও লয়লী—উস্‌কা বাদ গানা শুনাও—"

তারপর রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যাবলী দ্রুত আবর্তিত হতে লাগল। গেলাসের পর গেলাস মদ নিঃশেষিত হ'ল। চেতনায় জাগল একটা বহ্নিজ্বালা, আরক্ত চোখের সামনে সব কিছু থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। আর মেহের বিবির গান চলতে লাগল।

মেহের বিবি গাইতে লাগল—"সৈয়া—তু এক বেরি আ"—নানা ভঙ্গীতে, নানা তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে গানের পর গান চলল। সমস্ত ঘরটা যেন একটা সেতারের তারের মত ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। ওদিকে মদের

নেশায় দৃষ্টি ক্রমেই স্তিমিত হয়ে উঠল। পাঠান-রক্তের মধ্যে নিবিড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির আকাঙ্ক্ষা জাগল।

আকবর তাকাল মেহের বিবির দিকে। হ্যাঁ, সে সুন্দরী বটে। টলতে টলতে সে উঠল, মেহের বিবির কাছে গেল।

মুস্তাক বলল হেসে, "ক্যা হুয়া রে ?"

দাঁতে দাঁত চেপে আকবর বলল, "কুছ নেহি, বিবিকে একটু বুকে নেব।"

মেহের বিবি গান থামিয়ে মৃদুমন্দ হাসতে লাগল। আকবর তাকে বুকে টেনে নিল, ধীরে ধীরে দুটো লোভাতুর ঠোঁট নিয়ে গেল তার ঠোঁটের দিকে। কিন্তু সে আর অগ্রসর হতে পারল না, থেমে গেল।

মেহের বিবি মৃদুকণ্ঠে বলল, "কি হ'ল ওস্তাদ ?"

"কিছু না।" আকবর হঠাৎ ঠেলে দিল মেহের বিবিকে। হঠাৎ যেন একটা বিবমিষা ঠেলে ওপরে উঠতে চাইছে। না, এমনভাবে বোধ হয় কোনো নারীকে সে চায় নি। অতীত জীবনে এমনি অধ্যায় বহু ঘটেছে, তখন বোধ হয় এই ভাল লাগত। কিন্তু জেলখানায়, লোহার দরজার আড়ালে দিনের পর দিন কাটাতে কাটাতে আকবরের অনেক পরিবর্তনই ঘটেছে। আজ শুভ্র শয্যায় ব'সে কোনো নারী যদি তার চোখে ভালবাসার প্রদীপ জেলে তাকে অভ্যর্থনা জানাত, যদি কম্পিত আবেগে তাকে দুটো লতার মত বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরত, যদি অস্পষ্ট কথার ভেতর দিয়ে জানাত তার ভালবাসার কথা, তা হ'লেই বোধ হয় আকবরের ভাল লাগত। কিন্তু এই নোংরা গলিতে, এই চাকচিক্যময় ঘরে, বহুবল্লভা নারীর এই ক্লান্ত ভঙ্গীটা তার মোটেই

ভাল লাগল না, তার দেহের উত্তাপ যেন হঠাৎ ঘাম হয়ে বেরিয়ে এল, নেশাটা যেন ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে নাক কান দিয়ে বেরোতে লাগল, আর একটা বিবমিষা পেট থেকে ঠেলে উঠতে লাগল ওপর দিকে।

"না, ওসবে আমার দরকার নেই—আমি মদ খাব।" সে টলতে টলতে দূরে স'রে গেল।

মুস্তাক ও মেহের বিবির হাস শোনা গেল।

মুস্তাক মেহেরকে আশ্বাস দিয়ে কাছে টেনে নিল, "ঘাবড়ো না, তোমার মজনু তো আছেই লয়লী।"

আকবর মাথা নাড়ল। এই ভাল। ওরা যা ইচ্ছে করুকগে। তার কাছে মদই ভাল। অনেক দিন বাদে মদ পেয়েছে সে। মদটা এখনো ভাল লাগে, চমৎকার লাগে। পাত্রের পর পাত্র চলল। সব নিঃশেষিত হ'ল। তার চেতনায় ঝিল্লিরবের মত একটা ধ্বনি জাগল। চমৎকার! শেষে এক সময়ে অচৈতন্য হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল আকবর। তার সাংঘাতিক নেশা হয়েছে।

১৬ই আগস্ট। শুক্রবার। বেলা নয়টা।

প্রায় প্রত্যেক বাড়ি ও দোকানে লীগের পতাকা উড়ছে, সব দোকানই বন্ধ। গলির মোড়ে, কলুটোলাতে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। যানবাহনের শব্দ নেই, কেবল মাঝে মাঝে মোটর ট্রাকের ভারী আওয়াজ পাওয়া যায়। শোনা যায় 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' ও 'হিন্দু কংগ্রেস মুর্দাবাদ' ধ্বনি। গলি দিয়ে উত্তেজিত

লোকেরা লীগের ব্যাজ প'রে, ছড়ি ও লাঠি হাতে মোড়ে মোড়ে জমা হতে থাকে।

পরেশবাবুদের দোকানও বন্ধ, বন্ধ তাদের দরজা জানলা, কেবলমাত্র আজমলের বারান্দার মুখোমুখি জানলাটা একটু খোলা। তারই আড়াল থেকে আশঙ্কায় থমথমে পরেশের মুখমণ্ডলকে মাঝে মাঝে দেখা যায়।

হোসেন বাড়ি নেই, সকালবেলাতেই উঠে কোথাও পাণ্ডাগিরি করতে গেছে। লীগের সে একজন উৎসাহী সভ্য।

বাড়ির ভেতরকার মেয়েদের মধ্যেও উত্তেজনা সংক্রামিত হয়েছে। তারা বারংবার চিকের কাছে গিয়ে গলির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে। বাচ্চা চাকরটাও আজ উধাও হয়েছে, কৌতূহলকে দমন করতে পারে নি।

কিন্তু আজমলের এসব ভাল লাগছে না। মুসলমানদের স্বার্থের নামে নেতারা যেন মুসলমানদের স্বার্থহানিই করছেন। কারণ যাদের সঙ্গে চিরকাল থাকতে হবে, তাদের সঙ্গে লড়াই ক'রে কি কাজ আদায় হয়? হিংসা মানুষকে আরো হিংসার পথে টেনে নিয়ে যাবে, ওতে শুধু অনৈক্যই দিন দিন বাড়বে, লাভ হবে না কিছুই।

সময় কাটাবার জন্য আজমল কোরাণ খুলে বসল। কিন্তু সে পড়া আরম্ভ করতে পারল না। খোদাহ্‌তলার সৃষ্ট জীবদের মধ্যে এই বহুবিধ ভেদাভেদ ও হিংসাদ্বেষের কথা স্মরণ ক'রে তার চিত্ত ক্রমেই বেদনার্ত হয়ে উঠল। মনে পড়ল হজযাত্রীর কথা। সব কিছু ছেড়ে, পেছনে ফেলে, সামনের দিগন্তের দিকে সুদীর্ঘ যাত্রা—অবশেষে আল্লার দরবারে—সে এক বিচিত্র অনুভূতি—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত এক পরম আনন্দলোকের অনুভূতি—

"আব্বাজান্!"

আজমলের চমক ভাঙল। রোশানারা ডাকছে।

"হাঁ বেটী?"

"জলদি এসো—দেখো শীগগির।"

বাপের হাত ধ'রে রোশানারা সামনের বারান্দায় টেনে নিয়ে গেল। সাকিনাও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। নীচের দিকে তাকিয়ে আজমল দেখল যে, কুতুব মিনার হোটেলের সামনে একটা ভীড় জমেছে। তার মাঝে পাঁচজন আহত ও রক্তাক্ত-দেহ মুসলমান। তাদের মাঝে যে দুজন রিকশায় শায়িত তাদের আঘাত গুরুতর। আজমল তাদের চিনতে পারল। একজন বিড়ি-প্রস্তুতকারক নুর ও অপরজন মাংসবিক্রেতা গফুর। নুরের কাঁধ ও কোমরে ছোরার আঘাত, গফুরের হাত মুখ ও তলপেটে।

হঠাৎ সেখানে তাজ মহম্মদ এল। সঙ্গে মুস্তাক।

"বোলো সব বাৎ—" তাজ মহম্মদ আদেশ করল।

একসঙ্গে সবাই কথা বলতে সুরু করল। টুকরো টুকরো কথা ও মন্তব্য থেকে বোঝা গেল যে, ঐ সব আহত লোকেরা হ্যারিসন রোডের মোড়ে কতকগুলি হিন্দুর দোকানকে বলপূর্বক বন্ধ করতে যাওয়ায় মারামারি বাধে এবং তারই ফলে এই সব আঘাত।

"আচ্ছা, ইয়েহ বাৎ হ্যায়!" তাজ মহম্মদের চোয়াল দুটো গ্র্যানাইট পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল, নীলাভ চোখের তারা দুটো তার খোরাসানী তলোয়ারের মত ঝকমক ক'রে উঠল, সবার দিকে একবার নজর বুলিয়ে সে বলল, "আব্ সমঝ লেও ক্যা করনা হ্যায়—শালা কাফের লোগোঁকো লুঠো অওর মারো—মিঠি মিঠি লব্জোসে অব কাম নেহি বনেগা—সমঝে?"

বিদ্যুতের মত সবার মাঝে উত্তেজনা সংক্রামিত হ'ল।

"মারো—মারো শালে লোগোঁকো—"

"মারপিট তো উসি লোগনে স্থরু কিয়া—"

"খুন কা বদ্‌লা খুনহি সে লেঙ্গে—"

"আও মেরা সাথ"—তাজ মহম্মদ ডাকল, "অওর ইনলোগোঁকো হাস্‌পাতালমে লে যাও।"

কঠিন শপথ ক'রে কোলাহল করতে করতে সবাই তাজ মহম্মদকে অনুসরণ করল। জনকয়েক লোক আহতদের নিয়ে সাগর দত্ত লেন দিয়ে হাসপাতালের দিকে গেল।

কয়েকটি মুহূর্ত।

"দেখা আব্বাজান, দেখা?"—উত্তেজিতকণ্ঠে বলল রোশানারা।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল আজমল, "দেখলাম, দেখলাম মা।"

"দেখলে তো দোষ কার?"

আজমল বিষণ্ণভাবে হাসল, "সেটা ঠিক বলতে পারি না মা। ওরাই তো গায়ে প'ড়ে মারামারি করেছিল, হিন্দুরা তো এখানে এসে ওদের মেরে যায় নি?"

রোশানারা মানতে রাজী নয়, উত্তেজিতভাবে আরো কিছু সে বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু এমনি সময়ে তাজ মহম্মদকে আবার দেখা গেল, তার হাতে তলোয়ার। পেছনকার আর সবাইও সশস্ত্র। মোটা মোটা লাঠি, লোহার শিক, বল্লম, তলোয়ার, মাংস-কাটার ছোরা তাদের হাতে।

"চলো ইন্ত্‌কাম লেনা হ্যায়।"—তাজ মহম্মদ গর্জন ক'রে উঠল।

"হাঁ, খুনকা বদ্‌লা খুনসে লেঙ্গে।"—মুস্তাকও প্রতিধ্বনি তুলল। একটা লাল রঙের সিল্কের রুমাল দিয়ে সে মাথার তৈলহীন রুক্ষ চুলের রাশিকে ক'ষে বেঁধেছে; তার হাতে একটা বল্লম, চোখে মুখে একটা বন্য উল্লাস।

আজমল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, সে আর স্থির থাকতে পারল না। চিকটা ফাঁক ক'রে নীচের দিকে তাকিয়ে সে ব্যাকুলকণ্ঠে বলল, "আখের তুমলোগ কাঁহা যাতে হো ভাই?"

কারো কানে তার কথা পৌছোল না, নিজেদের রক্তাক্ত সংকল্পে তারা মশগুল ও উত্তেজিত।

দু'হাত মুখের দু'পাশে নিয়ে আজমল আরও জোরে চেঁচিয়ে ডাকল, "ভাই তাজ মহম্মদ, এ ভাই—"

তাজ মহম্মদ থমকে দাঁড়াল, তার কানে আজমলের ডাক এবার পৌছেছে। ওপর দিকে তাকিয়ে সে মুচকি হেসে বলল, "সেলাম ওয়ালেকম্ হাজী সাহেব।"

"ওয়ালেকম্ সেলাম"—দ্রুতকণ্ঠে প্রশ্ন করল আজমল, "তুমলোগ কাঁহা যাতে হো ভাই?"

"নজ্‌দিগ্‌মেহি।"

"ক্যা করোগে?"

তাজ মহম্মদ হাসল, "খোদা য্যায়সা ইসারা করতেঁ হ্যায়।"

"লুঠ আর মারপিট করাই কি খোদার ইসারা? আর তাতে লাভই বা কি ভাই?"

তাজ মহম্মদ একবার ভ্রূকুঞ্চিত করল, পরে শ্লেষভরে বলল," হামারি মামলে আপ জবান বন্ধ্ করকে সির্ফ দেখতে রহেঁ বড়ে মিঞা!"

"হাঃ হাঃ হাঃ"—তাজ মহম্মদের অনুসরণকারীরা হেসে উঠল।

সঙ্গীদের হাসি শুনে গর্বিত ভঙ্গীতে একবার ওপর দিকে তাকিয়ে তাজ মহম্মদ বলল, "চলো ভাই, দের মৎ করো।"

"লেকিন তাজ মহম্মদ!"—আবেগরুদ্ধকণ্ঠে আবার ডাকল আজমল।

"চলো, চলো সব।"—আজমলের আবেদন তাজ মহম্মদের আদেশের নীচে চাপা প'ড়ে গেল।

ওরা সবাই চ'লে গেল। দ্রুত ও ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে।

স্তব্ধ হয়ে রইল আজমল। কোথায় যেন একটা বিকার ঘনিয়ে উঠেছে, তা যেন প্রত্যেকের মাথায় প্রবেশ করেছে, সঞ্চারিত হয়েছে প্রত্যেকের রক্তে ও চেতনায়। বিশেষত দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকদের মধ্যে, যাদের কোন আদর্শ নেই, সংযম নেই। লোভ লালসায় আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে থাকার স্বপ্ন দেখে তারা, আল্লার নামে সেই স্বার্থ সংরক্ষণ ও বর্ধন করতে চায়। ফেরেশ্‌তার দল যেন পৃথিবী থেকে ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাদের জায়গায় অগণন শয়তান জেগে উঠছে দীর্ঘ দন্তপংক্তি মেলে। স্বার্থে স্বার্থে হানাহানি, লোভে লোভে সংঘাত, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। কেউ নেই, কল্যাণের পথের, শান্তির পথের, অগ্রগতি ও সৌন্দর্যলোকের পথের কোন পথিক নেই। সবাই দল বেঁধে, চোখ বুজে, পতঙ্গের মত অন্ধ মোহে, দুর্নিবার আকর্ষণে নরকের দিকে ছুটে চলেছে। অনিবার্য ধ্বংস থেকে তাদের বাঁচাবে কে? পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আজমল। নিরুপায় ভঙ্গীতে।

ফিস ফিস ক'রে রোশানারা বলল, "হিন্দুলোক আব্ মজা চিখেগা।"

সাকিনা বিবি এবার ধমক দিয়ে উঠল, "রোশানারা! ছিঃ!"

আজমল ন'ড়ে উঠল, মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কঠিনকণ্ঠে বলল, "জবান দুরস্ত করো বেটা—দুনিয়ার সবাই একই খোদার বান্দা।"

রোশানারা লজ্জা পেল। অল্প বয়সের উত্তেজনায় কোন কিছু না ভেবে সে একটা উক্তি ক'রে ফেলেছে। তাই কারো কাছে সায় না পেয়ে সে ভারি লজ্জা পেল। বাপের সামনে থেকে সে ছুটে পালাল।

সোজা সে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হ'ল। দিদি ফতিমা রান্না করছিল। বউদি জাহানারা ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। ঘরের মধ্যে গরম মশলা ও রশুনের একটা উগ্র গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

রোশানারা গিয়ে জাহানারার পাশে ব'সে পড়ল, ভাইপোর পা ধ'রে একটা টান দিল, বাচ্চাটা কেঁদে উঠল।

জাহানারা হেসে বলল, "এ আবার কি বহিন?"

রোশানারা মুখ বিকৃত ক'রে বলল, "ক্ষিদে পেয়েছে।"

জাহানারা বলল, "পেটে কিল মার তবে।"

ফতিমা হঠাৎ প্রশ্ন করল, "রাস্তায় এখন গোলমাল হচ্ছে কেন রে রোশানারা?"

রোশানারা এখানে পালিয়ে এসেছিল যে আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে আবার তা সুরু হওয়ায় সে বিরক্ত হয়ে উঠল, বলল, "কি আবার দাঙ্গা বাধবে মনে হচ্ছে।"

জাহানারা শঙ্কিত হ'ল, "দাঙ্গা কেন ভাই?"

"কেন আবার? হিন্দুরা আমাদের দাবী কিছুতেই মানছে না আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে কেন?"

ফতিমা বাপের মতাবলম্বী, সে এসব আলোচনা পছন্দ করে না, মাথা নেড়ে সে বলল, "যাক ওসব কথা, মারামারি কাটাকাটি ক'রে কোনো কিছুই করা উচিত নয় আমার মতে—ওতে মানুষ শুধু মরবেই, বাঁচবে না।"

জাহানারার ভয় কমে না, "কিন্তু কি হবে দাঙ্গা হ'লে ?"

ফতিমা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "যা হবার হবে। মোট কথা ওসব কথা তোলা থাক্ এখন। তুমি তোমার ছেলেকে দুধ খাওয়াও।"

রোশানারা সায় দিল, "তাই ভাল দিদি, আমিও চুপ করলাম। কিন্তু আমায় কিছু খেতে দে—খোদার কসম, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

সবাই হেসে উঠল।

সকালবেলাতেই অজিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আজ সুনন্দার বিয়ে। সকাল থেকেই ওদের বাড়ির হাসি ও কোলাহল শোনা যাচ্ছিল, শোনা যাচ্ছিল রান্নাঘরে মেয়েদের কলরব। তা শুনে একটা বিশ্রী জ্বালা বোধ করছিল সে, এই পরিণতি তার কাছে অপ্রত্যাশিত নয়, তবু যেন বুকের ভিতরে একটা কাঁটার মত কি বারংবার খচখচ ক'রে উঠছিল। বাড়িতে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। একটা কারাগারের মত মনে হচ্ছিল বাড়িটাকে। তাই সে খুব ভোরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরের আলো-

বাতাসে মুক্তি পাবার জন্য। তখনও ছোট ভাই সুজিত ঘুমোচ্ছে, আত্মীয়হীন পুরানো সরকার গোবিন্দবাবু ঘুমোচ্ছে, শুধু মা বাইরে মালা ঘোরাচ্ছিলেন। মাকে একটা মিথ্যে কথা ব'লেই দ্রুতপদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

ঘুরতে ঘুরতে যখন সে চৌরঙ্গী থেকে ফিরে আসছিল তখন সেন্‌ট্রাল এভিনিউতে সে যা দেখতে পেল তাতে হঠাৎ তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, দাঙ্গা অনিবার্য। সাত-আট বছরের ছেলে থেকে পঞ্চাশ বছরের বুড়ো মুসলমান পর্যন্ত ভীড় ক'রে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে লাঠি আর বাঁশের টুকরো। গাড়ি আসছে, মোটর আর রিকশা আসছে আর সঙ্গে সঙ্গেই 'মার্, মার্' শব্দ। এমন কি সাইকেল চ'ড়ে গেলেও রেহাই নেই।

হঠাৎ এক নিমেষে অজিতের দেহে একটা আতঙ্ক শিহরিত হ'ল। বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল যে, এদের 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' সত্যি 'সংগ্রাম' হবে। অসহযোগ-আন্দোলন বা অহিংস-প্রতিরোধ নয়, রীতিমত হিংসাত্মক সংগ্রাম—রক্ত দিয়েই তার ইতিহাস রচিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন র'য়ে গেল মনে। কার রক্ত পড়বে? নিজেদের ও ব্রিটিশের, না, হিন্দুদের?

অবস্থা খুব সুবিধের মনে হ'ল না, বাড়ির দিকেই পা বাড়াল অজিত।

সাগর দত্ত লেন দিয়ে ফিয়ার্স লেনে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল সে।

একদল সশস্ত্র মুসলমান আসছে গলি বেয়ে। তাদের চলার ভঙ্গী, চোখে মুখে ও অস্ত্র ধরার কায়দায় একটা নিষ্ঠুর সঙ্কল্প, একটা পাশব

ইঙ্গিত, এবং তাদের সবার আগে আছে তাজ মহম্মদ। শান্তির সময়ে যার গুণ্ডা ব'লে মারাত্মক কুখ্যাতি শুনেছে তার এখনকার চেহারা দেখেই অজিত বুঝতে পারল যে, সে কতদূর নৃশংস হয়ে উঠবে।

তাকে দেখেই তাজ মহম্মদ লাফিয়ে উঠল, বাঘের মত হুঙ্কার ছেড়ে বলল, "মারো শালাকো—শালা কংগ্রেসী হ্যায়।"

তলোয়ারটা ওঠাল সে।

মুহূর্তের জন্য ভয় পেল অজিত, তার পরেই সে পেছন দিকে দৌড় দিল। উর্ধ্বশ্বাসে। তাজ মহম্মদ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল, অজিতের পাশ দিয়ে সাঁ ক'রে একটা ছোরা বেরিয়ে গেল। কোমরে একটা লাঠিও এসে পড়ল। বেদনাবোধও হ'ল, কিন্তু তা অতি তুচ্ছ। প্রাণপণে দৌড়োল সে, তবু কয়েক জন তেড়ে এল। তখন অনন্যোপায় হয়ে ডান দিকের আর একটা ছোট গলি দিয়ে সে ছুট দিল। খানিকটা গিয়ে একবার পেছন ফিরে সে দেখতে পেল যে, অনুসরণকারীরা আর আসছে না।

গলিটা থমথম করছে, হিন্দুদের প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই সে বাড়ি ফিরল।

গোবিন্দবাবু বাইরের ঘরে ব'সে ছিল।

ভিতরে ঢুকেই পুরানো ফটকটাকে ঠেলে বন্ধ ক'রে দিল অজিত, তারপরে বাইরের ঘরের সিঁড়ির ধাপে ব'সে পড়ল। কম্পিত শরীরের রক্ত তখন তোলপাড় ক'রে মাথায় উঠেছে, হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন পাগলা ঘণ্টার মত সজোরে ধক্ ধক্ শব্দে বেজে চলেছে, কোমরের বেদনাটা টন্‌টন্ করছে।

ফটক বন্ধ করার শব্দে গোবিন্দবাবু তাকাল, তারপরে অজিতের ব'সে থাকার ভঙ্গী দেখে শঙ্কা জাগল তার মনে, এগিয়ে এসে সে প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে খোকা—এঁ্যা ?"

মৃদুকণ্ঠে অজিত জবাব দিল, "দাঙ্গা।"

"দাঙ্গা!"

"হাঁ, আর আমাদের গলিতেও তা ছড়িয়ে পড়বে মনে হচ্ছে।"

গোবিন্দবাবুর চোখ বড় হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ধ্বনিত হ'ল, "তা হ'লে কি হবে? এ গলিতে ক'জন হিন্দুই বা আছে আর তারা করবেই বা কি ?"

ম্লান হেসে অজিত বলল, "আমিও ভাবছি, কিন্তু কোনই জবাব পাচ্ছি না।"

স্বর্ণকার পরেশের ওটা নিজের বাড়ি নয়। আসলে সে যতটুকু অংশে থাকে তা একটা বড় বাড়ির অর্ধাংশ। বাড়িওয়ালারা বাকি অর্ধাংশে থাকে। একটা দরজা মারফৎ যোগাযোগ আছে দুই অংশের সঙ্গে। ভেতরেই আট-দশ হাত দেয়াল খাড়া ক'রে বাড়ির উঠোনটা বিভক্ত হয়েছে এবং তার সঙ্গে বাড়িটা। 'বাড়িওয়ালারা' বলার কারণ এই যে, তিন ভাই এই বাড়ির মালিক। নিবারণ পাইন ও তার দু'ভাই গজানন ও পঞ্চানন। নিবারণ ও গজানন বিবাহিত, প্রত্যেকের চার-পাঁচটি ক'রে ছেলেমেয়ে, পঞ্চানন অবিবাহিত। সত্তর বছরের বুড়ী মা এখনও বেঁচে আছে, ধনুকের মত পিঠটা বেঁকে গেলেও বুড়ী এখনও

চলাফেরা করতে পারে, দু-চারটে দাঁত দিয়েই ছেঁচা পান চিবিয়ে খায়, ঝাঁঝালো সুরে বিড়বিড় ক'রে কথা বলে, ছেলেদের বউদের ধমকায় আর শাসায়। ভাইদের মধ্যে গজাননই ম্যাট্রিকটা পাস করেছে এবং সে একটা মার্চেন্ট অফিসে আশি টাকা মাইনের চাকরিও করে। বাকী দু'ভাই বেকার। বাড়িভাড়া ও হুগলী জেলাস্থ নন্দনপুর গ্রামের কয়েক বিঘা পৈতৃক জমির আয়—এই দিয়েই সংসার চ'লে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে তুমুল ঝগড়া বাধে বাড়িতে। বেকার ভাইদের সঙ্গে উপার্জনক্ষম ভাইয়ের। মায়ের সঙ্গে ছেলেদের। ছেলেমেয়েদের মারামারি উপলক্ষ্য ক'রে বউতে বউতে, পরে ভাইয়ে ভাইয়ে। ঝগড়া বাধে শাশুড়ী ও বউদের মধ্যে, পরে ছেলেদের সঙ্গে মায়ের। চক্রাকারে। অনবরত।

এককালে বাপ ব্যবসা ক'রে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিল, বাড়ি তুলেছিল, পরে আবার নিজেই সেই টাকা উড়িয়েছিল মদ আর মেয়েমানুষে। কিছুদিনের মধ্যেই তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, গুপ্ত যৌনব্যাধির ফলে উন্মাদ হয়ে যায় সে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাই ছিল। রক্তের সঙ্গে সেই ব্যাধিও পেয়েছে ছেলেরা। ছেলেদের সাহচর্যের ফলে তাদের মা ও বউয়েরা এবং তাদেরই সন্তান ব'লে তাদের ছেলেমেয়েরা। এমনিতে ওদের হয়তো সুস্থ মনে হবে, কিন্তু কিছুদিন লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, কোথায় ওদের বিকার লুকোনো আছে। পুরোনো বাড়িটার ভেতরে বেশি সংস্কার হয় না, স্যাঁতসেঁতে ও ভারী একটা ভাব—তা আরো অস্বস্তিকর মনে হয় এই সব বিকৃত লোকগুলোর জন্য।

পঞ্চাননের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি প্রকট এই পাগলামী। তার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। স্নানের বালাই নেই, নোংরা কাপড় পরণে, বিস্মৃত যুগের একটা ছেঁড়া, লম্বা ও ঢোলা কোট তার গায়ে, মাথার চুল খাড়া খাড়া। আকৃতি শীর্ণ আর সেই মাংসহীন মুখের কোটরগত চোখের তারা দুটোতে আছে একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য। অনবরত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় তার চোখের দৃষ্টি, এমন কি কারো সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও তার সেই চঞ্চল দৃষ্টি পোষ মানে না। বিড়বিড় ক'রে কি যেন বলতে থাকে সে, পাড়ায় সবার সঙ্গে গিয়ে দিনরাত যেচে আলাপ করে, ব্রাহ্মণ দেখলেই তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, আড়ালে সবাইকে বলে যে, শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণেরা দেবতুল্য সুতরাং ওদের আশীর্বাদে একদিন তার বরাত ফিরে যাবে, ভাইয়েরা তাকে খাতির করবে। আজ নয়, পঞ্চানন বরাবরই ওই। সবাই জানে যে, ও পাগল।

শুধু পাড়ার লোকেরাই নয়, নিবারণ, গজানন, মা, তার বৌদিরা, এমন কি বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তাকে পাগল বলে।

পঞ্চাননের ভোঁদড় নামক যে ভাইপোটির বয়স মাত্র পাঁচ বছর তাকে যদি সে কখনো অবাধ্যতার জন্য ধমক দেয় তখন ভোঁদড়ের মত দুগ্ধপোষ্য শিশু পর্যন্ত মুখ ভেংচে, দু'হাতের বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বলে, "কচু—কচু করবি।"

পঞ্চাননের হঠাৎ বীর-রসের উদ্রেক হয়, ডান হাতের তর্জনীটা উদ্যত ক'রে সে হয়তো চেঁচিয়ে বলে, "কার সঙ্গে কথা বলছিস সে খেয়াল আছে রে হতভাগা, এ্যাঁ? চড়িয়ে তোর মুখ লাল ক'রে দেব, কান ছিঁড়ে ফেলব—"

একটু নিরাপদ দূরত্ব রেখে ভোঁদড় পূর্ববৎ ব'লে, "দূর—তুই তো পাগলা—"

হঠাৎ কুঁকড়ে যায় পঞ্চানন। তাকে কেউ পাগল বললেই যেন আগুনে জল পড়ে, নির্বিষ ভুজঙ্গের মতই উদ্যত ফণাটাকে তখন সে গুটিয়ে নেয়, নিজের ঘরের কোণে গিয়ে তেল-চিটচিটে বিছানাটার ওপর হাঁটু ভেঙে ব'সে বিড় বিড় ক'রে বকতে আরম্ভ ক'রে দেয়।

বলতে থাকে, "ম'রে যাব, গলায় দড়ি দেব। কি হবে বেঁচে? আমায় কেউ গেরাহ্যিই করে না, এত্তটুকু ছেলে—সেও না।"

আজও ভাইয়েরা ঝগড়া করছিল। বাজারের ব্যাপার নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছে।

গজানন বলল, "তেল আনতে হবে? বেশ তো, আনো গে।"

নিবারণ ধমক দিল, "আনো গে মানে? টাকা দে।"

"ইস্! টাকা দে—আমি কি টাকার গাছ নাকি? সব কিছু আমাকেই দিতে হবে? কেন, তোমরা রোজগার করতে পার না?"

নিবারণ যেন আকাশ থেকে পড়ল, যেন অপমানিত হ'ল এমনি একটা ভাব তার চোখে মুখে ফুটে উঠল, "কি বললি? তুই বলতে পারলি এমন কথা? কেন, আমি কি কোনদিন রোজগার করি নি?"

"যা রোজগার করেছ জানা আছে।"

পঞ্চানন এবার তার তেল-চিটচিটে বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসল, "অমন কথা বলতে পারলে দাদা! এমন দিন কি চিরকালই

ছিল, আমিও এককালে চাকরি করেছি—চাল্লিশ টাকা মাইনে পেতাম না আমি? তবে অনেক শালা পেছনে লেগেছিল ব'লেই চাকরি গিয়েছিল। কিন্তু ক'দিন? আবার পাব, তোমার এ সব বড় ফট্টাই তখন থেমে যাবে।"

নিবারণ ধমক দিল, "যা যা, চুপ কর্।"

পঞ্চানন গ'র্জে উঠল, দু চোখের তারা বড় ও ঘূর্ণ্যমান ক'রে বলল, "কেনে, চুপ করব কেনে? অনেক তো চুপ ক'রে আছি কিন্তু আর চুপ করব না—তোমাদের জ্বালায় আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।"

গজানন এবার নিবারণের সহায় হ'ল, ছোট ভাইকে ধমক দিয়ে বলল, "নে নে থাম্, আবোল-তাবোল বকিস না।"

"আমি আবোল-তাবোল বকছি!"

"বকছিসই তো।"

"তা হ'লে তাই বকব—"

"বুড়ো বয়সে থাপ্পড় খাবি হারামজাদা।"

"গাল দিলে, তবে আমি গলায় দড়ি দেব—মা, মা—"

ধনুকের মত বাঁকা-পিঠ বুড়ী মা এসে হাজির হ'ল, "কি হচ্ছে, এ্যাঁ? ও ছেলেটাকে অমন কোণঠেসা করেছিস্ কেন তোরা? তোদের মনে কি আছে বল্ তো? শত্তুর, তোরা সব আমার শত্তুর—"

নিবারণ তিক্তকণ্ঠে বলল, "থাম মা।"

"কেনে, থামব কেনে রে অলপ্পেয়ে? কি ভেবেছিস তুই? বুড়ী হয়েছি ব'লেই বুঝি যা-তা করবি তোরা?"

গজানন বিরক্ত হয়ে উঠল, "কি সব যা-তা বলছ মা?"

"যা-তা বলছি?" বুড়ীর বাঁকা পিঠ যেন ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত

সোজা হয়ে উঠতে চাইল, "যা-তা তোদের বাবা বলত, যা-তা তোরাই বলিস, আমি কেনে বলব রে—এ্যাঁ ?"

পঞ্চানন তখন চোখ ঘোরাচ্ছে, যেন সমস্ত পৃথিবী তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এমনি বিপন্নভাবে সে বলল, "দিনরাত এই সব চলছে—কদ্দিন তা সওয়া যায়, কদ্দিন ? এবার আমি কিন্তু বাড়িঘর ছেড়ে চ'লে যাব—যাবই—তোমাদের মুখ দেখলেও পাপ হয়।"

নিবারণের বোধ হয় একটু ব্লাড প্রেসার আছে, সে একটুতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পঞ্চাননকে হঠাৎ সে ক্ষিপ্তকণ্ঠে ধমক দিল, দু'পা এগিয়ে গিয়ে হাত নেড়ে বলল, "চুপ, চুপ কর্ পাগলার ডিম।"

কুঁকড়ে গেল পঞ্চানন, তেল-চিটচিটে বিছানাটার ওপর সে গড়িয়ে পড়ল, দু হাতে মুখটা ঢেকে সে বিলাপের মত বিড় বিড় ক'রে বলতে লাগল, "কি হবে? বেঁচে আর কি হবে? আমায় কি ওরা মানুষ ব'লে ভাবে—মোটেই না। এর চেয়ে আজ গলায় দড়ি দেব, ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ব, দেয়ালে মাথা খুঁড়ব—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করব তা। বাধা দেবে? ইস্, দেখি না মুরোদ কত! কান ছিঁড়ে ফেলব, দাড়ি উপড়ে ফেলব, ঠ্যাং খোড়া ক'রে দেব—"

এমনি সময়ে একটা উৎকট কোলাহলের শব্দ ভেসে এল।

"মারো—মারো—লুটো অওর মারো—"

ঘরের ভেতরে ঝগড়া থেমে গেল।

বুড়ী প্রশ্ন করল, "ও কি রে নিবারণ, ও কিসের শব্দ ?"

নিবারণ বলল, "বুঝতে পারছি না।"

গজানন কথা বলল না, শুধু বেরিয়ে গিয়ে বাইরের দরজাটা বন্ধ কিনা দেখে এল।

"কি দেখলি রে গজা ?"

"দরজা জানলা সব বন্ধ রাখতে হবে—মনে হচ্ছে যেন লীগওয়ালারা হাল্লা করছে।"

"মারো মারো বলছে কেন রে ?"

"কি জানি !"

বাড়ীর দুই অংশের মাঝামাঝি যে দরজা তাতে হঠাৎ দুম্‌দাম্‌ ঘা পড়ল আর পরেশবাবুর ডাক শোনা গেল।

"নিবারণবাবু—ও মশাই—শুনছেন—"

নিবারণ এগিয়ে গেল, "খুলছি—খুলছি পরেশবাবু—"

দরজা খুলতেই পরেশবাবুর পাংশু মুখ দেখা গেল। লোকটার চোখে মুখে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ রেখান্বিত হয়ে উঠেছে।

"ব্যাপার তো খুব সুবিধের নয় নিবারণবাবু।"

"কেন, কি হ'ল ?"

"দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেছে—পাড়ার গুণ্ডারা দল বেঁধে হিন্দুদের মারধোর করবে মনে হচ্ছে।"

"এ্যাঁ!" নিবারণের সমস্ত শরীরটা যেন হঠাৎ ভয়ে অবশ হয়ে এল। সে এমনিতেই ভীতু মানুষ, ঘরের ভেতর ইঁদুরের শব্দ শুনেও সে ভয় পায়, দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা শুনে আরও ভয় পেল। ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকাল সে পরেশের দিকে, শুকনো গলায় বলল, "কি হবে ভাই পরেশবাবু ?"

পরেশও তার মত শুষ্ককণ্ঠে বলল, "তাই তো ভাবছি, বাড়ির ছেলে-মেয়েরা বেজায় ঘাবড়ে গেছে।"

গজানন বলল, "কিন্তু ঘাবড়ে গেলেই তো চলবে না। দরজা-টরজা

সব বন্ধ ক'রে ভেতরে থাকুন—বাড়ির ভেতর ব'য়ে এসে তো আর কিছু করবে না।"

"বিশ্বাস কি ?"

"না না, তা কি হয় ?

পরেশ একটু ভাবল, পরে বলল, "আজমলকে একটু ব'লে রাখব ?"

"কি ?"

"এই আমাদের একটু বাঁচাবে ?"

গজানন হাসল, "কিছু হ'লেই না হয় বলবেন।"

নিবারণ বাধা দিল, ভায়ের মোড়লি ভাব তার পছন্দ হ'ল না, দ্রুতকণ্ঠে সে বলল, "না ভাই পরেশবাবু, গজার কথার কোনও দাম নেই, আজমলকে আপনি একটু বলুন—কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে শেষে বিপদে পড়ব নাকি ?"

"তাই—তাই—" পরেশ তাড়াতাড়ি এগোল।

"আপদ বিপদ হ'লেই ডাক দেবেন, বুঝলেন, আমাদের ফেলে যাবেন না ভাই।" আকুলকণ্ঠে বলল নিবারণ।

"নিশ্চয়ই—সে কি আর বলতে হবে ?"

পরেশ ভেতরে গেল।

তেল-চিটচিটে বিছানার ওপর থেকে তখন পঞ্চানন বিড়বিড় ক'রে বলছে, "দাঙ্গা হবে, না, হাতী হবে, ঘোড়া হবে, উট হবে। কেন—কেন ওরা মারবে আমাদিকে ? কি করেছি বাবা ? এ্যাদ্দিন ধ'রে ওদের মধ্যে আছি—কি ক্ষেতিটা করেছি ওদের ?"

"চুপ কর্ পঞ্চা, বিড়বিড় করিস না।"—গজানন ধমক দিল।

"কেনে, চুপ করব কেনে ? কি অন্যায়টা বলছি শুনি ?"

"আচ্ছা পাগল নিয়ে পড়েছি বাবা, জান শেষ হয়ে গেল।"

"মরব—আমি ছাত থেকে লাফিয়ে মরব—আমায় কি তোমরা মানুষ ব'লে গণ্যি কর—কি সুখে আমি বাঁচব বাবা? না, আজই আমি গলায় দড়ি দেব।"

আজমলের মনে হ'ল, কে যেন ডাকছে! সে তাকাল। জানালা দিয়ে পরেশবাবু ডাকছে। গর্ত থেকে ভয়ার্ত খরগোশ যেমন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে তেমনিভাবে সে চারদিক দেখে নিয়ে আজমলকে ডাকছে।

"আজমল ভাই—আজমল—"

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে পরেশ, তার চোখের তারাতে আতঙ্কের সুপরিস্ফুট ছাপ।

"আজমল—আজমল—"

"কি হ'ল পরেশ?"

"কি হবে ভাই?"

"কি আবার হবে—ডরো মৎ।"

"ডরাই কি আর সাধে রে ভাই? ছেলেমেয়ে বউদের জন্যেই ডরাই, আমার নিজের জন্যে নয়।"

"চুপচাপ ব'সে থাকো না ভাই—ওরা আর কি করবে? মহল্লার লোক তুমি, তোমার ঘরে ঢুকে তো আর লুটপাট করবে না—আর যদি সে রকম কিছু করতে যায়, আমি কি চুপ ক'রে থাকব?"

অসহায় তৃণখণ্ড যেমন কূল পাবার আশায় একটু আশ্বস্ত হয় তেমনি

একটু আশ্বাসের ভাব পরেশের মুখের উপর দেখা গেল। অবোধ পশুর কৃতজ্ঞতার মত একটা দুর্বল ও বিনীত ভাব তার পঞ্চাশ বছরের মুখে চোখে আত্মপ্রকাশ করল।

ওদিকে দূর থেকে একটা সুতীব্র, সুতীক্ষ্ণ আর্তনাদ ঝিসর্পিল গলিপথ বেয়ে এদিকে এল। কাকে যেন পিটে পিটে মারা হচ্ছে। আর শোনা গেল কোলাহল। "লুঠো, মারো, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

কতকগুলো নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ছুটে গেল। কারো হাতে চার-পাঁচটা করে শাড়ি ধুতি, কারো কোঁচড়ে চাল ডাল, কারো কারো হাতে ভাঁড়-ভর্তি মিষ্টি। সাগর দত্ত লেনের হিন্দু ধোপা, মুদি ও মিষ্টির দোকান লুণ্ঠিত হয়েছে।

কান্না ভেসে এল। বায়ুস্তর বিক্ষুব্ধ ক'রে একটি নারীকণ্ঠের কান্না ভেসে এল। ভয়াবহ কান্না।

পরেশবাবুদের বাড়ির কিছুদূরে থাকেন গোলোক চাটুজ্জে। ভদ্রলোক একটি ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বড়বাবু, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। সংসারে স্ত্রী, দুই ছেলে, তিন মেয়ে। বড় ছেলে রেলে চাকরী করে, ছোট ছেলে পড়ে। বড় মেয়ে বিধবা, বাকি দুই মেয়ে অবিবাহিতা। নির্ঝঞ্ঝাটে থাকেন গোলোকবাবু, কারো সাতে-পাঁচে নেই তিনি।

গলির ভেতর যে উচ্ছৃঙ্খলতা ঘনিয়ে এসেছে তা সবাই টের পেলেন। বাড়িটার দোতালায় থাকেন তাঁরা, নীচের তলায় একজন হিন্দুর দোকান। দোকানটা আজ বন্ধ।

স্ত্রী গিরিবালা বললেন, "ছেলেমেয়েদের কি করব ?"

গোলোকবাবু চিন্তিতমুখে মাথা নাড়লেন, "বুঝতে পারছি না।"

"কোথাও গেলে হয় না ?"

"পাগল নাকি—কোথায় যাবে ? গাড়ি ঘোড়া নেই, ট্রাম বাস বন্ধ—গেলে হেঁটে যেতে হবে। আর এই সব গুণ্ডাদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবে কি ক'রে ?"

বড় ছেলে অবিনাশও সায় দিল তাতে—"ঠিকই তো, ওসব কথা ভেবো না মা। বাড়িতেই ব'সে থাকতে হবে—এইমাত্র—দেখা যাক না কি হয় !"

অন্যান্য ছেলেমেয়েরা চুপচাপ ব'সে আছে। মাঝে মাঝে জানলা ফাঁক ক'রে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করছে, তারপরেই আবার বিবর্ণ শঙ্কাতুর মুখে ফিরে আসছে, ব'সে পড়ছে। গতিক সুবিধের নয়।

বাপ ভাই বাইরে। খাতুনা রান্নাঘরে ব্যস্ত। স্বামীর সঙ্গে কথা বলার মত ফুরসুৎ ও ধৈর্য তার নেই।

বাড়ির মধ্যে শুধু ছেলেটাই তাকে খাতির করে। ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরল আকবর।

"বোল্ বেটা—আব্বাজান।"

"আ-বা-জা—" ছেলেটা গোটা আটেক দাঁত মেলে হেসে বলল।

"ঠিক, ঠিক বোলা বেটা।"

এমনি সময়ে বাইরে থেকে কে যেন ডাকল, "আকবর—এ আকবর !"—মুস্তাকের কণ্ঠস্বর।

বাইরে গিয়ে দাঁড়াল আকবর।

"কি রে, কি খবর ?"

মুস্তাক উত্তেজিত, "জল্‌দি চল্‌ বেটা, জল্‌দি।"

"কোথায় ?"

"সেদিনের কথা মনে নেই—তাজ মহম্মদের কথা ?"

"কি কথা ?"

"আমাদের লড়াই সুরু হয়েছে, পাকিস্তান কায়েম করার লড়াই—জল্‌দি চল্‌—"

"কিন্তু লড়াই মানে তো খুন জখম, রক্তারক্তি ?"

মুস্তাক হাসল, "তুই কি তবে গান্ধী হ'লি নাকি রে, এঁ্যা ?"

"ধ্যেৎ !"

"তবে চল্‌।"

"আসছি।"

রান্নাঘরে গেল আকবর।

"লেড়কাকো ধরো খাতুনা।"

খাতুনা কটমট ক'রে তাকাল তার দিকে, শ্লেষতিক্তকণ্ঠে বলল, "কেঁও, বাহার যাওগে ?"

"হাঁ।"

"লেকিন কেঁও ? ঘরমে মন বৈঠ্‌তা নেহি ?"

আকবর ম্লান হাসল, "তা নয় খাতুনা, গোসা ক'রো না। আজ কি সব গোলমাল হচ্ছে তাই একটু দেখে আসি।"

কোন জবাবের অপেক্ষা না ক'রে ছেলেকে মেঝেতে বসিয়ে সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"চল্ মুস্তাক।"

দুজনে চলল দ্রুতপদে।

আড়াই বছরে অনেক আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে দেশে। আকবর অবাক হয়ে যায়। পাকিস্তান? কথাটা মন্দ না। কিন্তু হিন্দুরা এমন কি দোষ করল যে, এতদিন পরে তাদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা যাবে না? আচ্ছা, দেখাই যাক না। সে গুণ্ডা, চিরকাল নিজের স্বার্থ নিয়ে মারামারি করেছে, সবার জন্যে, বিশেষত জাতভাইদের জন্যে, কোনদিন কিছু করার কল্পনাও সে করে নি। আজ যখন সেই সুযোগ এসেছে তখন সে তা ছাড়বে কেন? এই দুদিনেই সে আবছা আবছা বুঝতে পেরেছে যে আজ গোলমাল হবে, হয়তো রক্ত ঝরবে। কিন্তু কি রকম গোলমাল হবে, কার রক্ত পড়বে! দেখাই যাক না। আকবরের কৌতূহলটা উদগ্র হয়ে উঠল।

ঘড়ির কাঁটায় বেলা একটা।

"পাকিস্তান জিন্দাবাদ—"

"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান—"

"মারো, দুশমনোঁকো মারো, লুঠো—"

সশস্ত্র জনতা জোয়ারের নদীর মত ফেঁপে উঠেছে। তাতে ফিয়ার্স লেনের বিড়ি ও মাংস-বিক্রেতারা আছে, আছে পকেটমার, দালাল ও চর্মব্যবসায়ীরা। কিন্তু বেশীর ভাগই এবার অন্য পাড়ার লোক দেখা গেল। এবং তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বুই জন লোকই পশ্চিমা

মুসলমান। তাদের সর্বাগ্রে খোলা তলোয়ার হাতে তাজ মহম্মদ। তার তলোয়ারের অগ্রভাগে লাল রক্তের লেখা, তার বুটিদার পাতলা পাঞ্জাবির গায়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত। যেন কোন হিন্দু তার জামায় খুনখারাপি রংয়ের ছিটে লাগিয়ে হোলি খেলে ফিরেছে। তার পাশে মুস্তাক। মুস্তাকের পাশে এবার আকবরকেও দেখা গেল। তার হাতে একটা বড় চকচকে ছোরা।

মোড়ে এসে দাঁড়াল তাজ মহম্মদ। সে জনতাকে পরিচালিত করতে জানে। সে জানে কোন্ ভঙ্গীতে আদেশ করলে এই অন্ধ, লোভী ও উন্মত্ত জনতাকে বশ করা যায়।

যেন কুকুরদের কেউ ধমকাচ্ছে এমনিভাবে সে বলল, "লুট্ লে ভাইসব, ইস্ গলিকা যিৎনা হিন্দু—সবকো লুট্ অওর মার্—"

"মারো, লুটো"—গর্জন ক'রে উঠল সবাই।

আকবরের চোখে বিস্ময়।

"ইসলাম্ অওর মুসলিম লীগ কো দুশমনোঁকো মজা চিখাও—"

তাজ মহম্মদ গলির অপর প্রান্তের দিকে তাকাল, বলল, "চলো ভাই, পহলে উধার সাফ করেঙ্গে—"

আকবর হাসল। ম্লান হাসি। মুক্তির জন্য, পাকিস্তানের জন্য এই কি মুসলমানদের লড়াই, এই ভাবেই কি পবিত্র ব্রত সাধিত হবে? এ কাজ তো গুণ্ডাদের, বদমায়েসদের—পৃথকভাবে না ক'রে দল বেঁধে করা হচ্ছে, এইমাত্র। আচ্ছা, দেখা যাক। এখন স'রে গেলে হয়তো এদের কাছে নিঃগৃহীতই হতে হবে। তার চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকাই ভাল, সময় বুঝে যদি বাধা দেওয়া যায়, যদি এদের অন্যপথে পরিচালিত করা যায়!

"চলো—চলো—"

গর্জন ও কোলাহল করতে করতে সবাই সেদিকে যাত্রা করল। কিন্তু কেউ আজমলের ডাক শুনতে পায় নি।

আজমল ওপরে ছিল না। জনতার রূপ দেখে ও অভিসন্ধি বুঝে সে দ্রুতপদে নীচে নেমে গিয়েছিল।

সাকিনা বিবি তার হাত ধ'রে টান দিয়েছিল, বাধা দিয়ে বলেছিল, "তুমি কেন যাবে, অত লোকের বিরুদ্ধে তুমি একা গিয়ে কি করবে?"

ফতিমাও নিষেধ করেছিল, মেয়েদের সবারই মত ছিল এর বিরুদ্ধে।

আজমল উত্তেজিতকণ্ঠে স্ত্রীকে বলেছিল, "বিবি, ওদের সামনে যদি কেউ না দাঁড়ায় তবে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, আল্লার দুনিয়ায় শয়তান ছাড়া আর কোনো লোক নেই।"

নীচে গিয়ে সে চীৎকার ক'রে বলেছিল, "শোনো তাজ মহম্মদ, শোনো। জল্লাদ হ'য়ো না, নির্দোষ লোকদের ওপর অত্যাচার ক'রো না। ফেরো, আল্লার পিয়ারা বনো, আমাদের যা চাই তা ধর্মযুদ্ধ ক'রে আদায় করো—তাজ মহম্মদ—"

কিন্তু কেউ শুনল না আজমলের কথা। ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে ঝড়কে থামতে বললেই কি তা থামে? আদিম যুগের বন্য পিপাসাটা আজ হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বহুদিনের অবদমিত ঘৃণা ও হিংসা আজ হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত একটা অন্ধ আবেগ—একজন লোক তাকে থামাবে কি ক'রে?

কেবল আকবর শুনেছিল তার কথা। সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে সে আজমলের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু কিছুই বলার উপায় ছিল না।

যে জনস্রোতে সে ভেসে চলেছে তার হিংস্র স্বরূপটা তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল এবং বহুদিনের পুরানো পাপী ব'লেই সে অনুভব করেছিল যে, এখন কিছু বলা নিরর্থক—তাতে শুধু নিজের বিপদই ডেকে আনা হবে, লাভ হবে না কিছুই।

ওদিকের বাড়ির দোরগোড়া থেকে মৌলবী নুরুদ্দিন হেসে বলল, "হাজী সাহেব, ভেতরে যান। আপনার একার কথা এখন কেউ শুনবে না।"

আজমল মৌলবীর দিকে তাকাল, ক্ষণকাল নিঃশব্দে থেকে সে ক্লান্তকণ্ঠে বলল, "কিন্তু আমি একা কোথায় নুরুদ্দিন, তোমরা—তোমরা কি এতে বাধা দেবে না?"

মৌলবী মাথা নেড়ে আফশোষের সুরে বলল, "আমরা অসহায় হাজী সাহেব, বাধা দিলে যে আমাদেরই অবস্থা ওরা খতরনাক্ ক'রে দেবে।"

আজমল বুঝতে পারল যে মৌলবী ভয় পেয়েছে। ভয়ে অন্যায়, অবিচার ও অধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস হারিয়েছে, ভয়ে সে ও তার মত অন্যান্য লোকেরা কাপুরুষ হয়ে গেছে। গুণ্ডার ভয়; উচ্ছৃঙ্খল জনতার ভয়। কদর্য ভয়।

নিরুত্তরে একবার আকাশের দিকে তাকাল আজমল। খোদা, তোমার আওয়াজ কই?

আওয়াজ পেল আজমল। মনে পড়ল পরেশের কথা। আর দেরি নয়।

আর্তনাদ, আবার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। দরজা ভাঙার শব্দ আসছে। আসছে ক্রোধোন্মত্ত জনতার বিকট চীৎকারধ্বনি। প্রকাশ্ত দিবালোকে নরকের রাত নেমে এসেছে, এসেছে নরকের যত অতৃপ্ত প্রেতের দল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল আজমল।

দুজন হিন্দু—একজন উড়িয়া ও অপরজন বাঙালী, কোন এক ফাঁকে এক পাশ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ কোত্থেকে যেন একজন চীৎকার ক'রে উঠল, "আরে, হিন্দু হ্যায়—"

"মারো—মারো—" রব উঠল।

চারদিক থেকে গোটা দশেক অস্ত্রধারী লোক এসে হাজির হ'ল।

বাঙালীটি বলল, "আমরা কি করেছি ভাই? ছেড়ে দাও, আমাদের ছেড়ে দাও—"

"ছোড়ি দেও—ছোড়ি দেও! য্যায়সা মেরে শশুরা হ্যায় কি ছোড় দেঙ্গে—শালা হারামিকা বাচ্চা—"

হঠাৎ কিল চড় বর্ষিত হতে লাগল।

আজমল দৌড়ল সেদিকে।

কিন্তু তার আগেই কাজ শেষ হয়ে গেল। লাঠি ও ছোরার ঘায়ে রক্ত-বন্যা বইয়ে, অন্তিম চীৎকারে ফিয়ার্স লেনকে সচকিত ক'রে লোক দুটো রাস্তার উপর ঢ'লে পড়ল।

দাঁড়িয়ে পড়ল আজমল, টলতে টলতে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, "বেওকুফলোগ, ক্যা কিয়া, তোমলোগ ক্যা কিয়া ভাই? কাহে ইয়ে গুণাহ কিয়া?"

একজন হেসে বলল, "গুণাহ্! ক্যা বোল্‌তে হো মিঞা! কাফেরকো মারনা কভি গুণাহ্ হোতা হ্যায়?"

"হাঃ হাঃ হাঃ—" সবাই হেসে উঠল, "যাও যাও বড়ে মিঞা, ঘর যাও—"

লিনটিং-এর দোকান থেকে ভাঙা রেকর্ডের বেসুরো আওয়াজ ভেসে আসছে। ভেসে আসছে লুণ্ঠন ও হত্যার, জনতার কোলাহল আর মাথার ওপরকার আকাশে হাল্‌কা মেঘের আড়ম্বর চলেছে। হয়তো বৃষ্টি নামবে। নামুক, খোদার ক্রোধ ঝড় বৃষ্টি ও বিদ্যুতের রূপে আত্মপ্রকাশ করুক, ওদের আসুরিক শক্তি ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করুক, অপহরণ করুক। আজ যদি ঈশ্বরের চোখে অভিশাপের সর্বগ্রাসী আগুন জ্ব'লে ওঠে, আজ যদি সমস্ত পৃথিবীটা সেই আগুনের স্পর্শে পুড়ে যায়, ভস্ম হয়ে মিলিয়ে যায় বিরাট শূন্যের মাঝে, তা হ'লে আজমল একটুও দুঃখিত হবে না—একটুও না।

নিবারণ কাঁপছিল। ঘরের কোণে দুই হাঁটুর উপর মাথা গুঁজে ব'সে সে থরথর ক'রে কাঁপছিল।

সবাই জড় হয়েছে ঘরের মধ্যে। বন্যার্তরা যেমন এক জায়গায় জড় হয়ে কাঁপতে থাকে জলের উচ্ছ্বাস দেখে, তেমনিভাবে ওরা কাঁপছিল। ভয়, দুর্নিবার ভয়। ভয়, কুৎসিত ভয়। বউয়েরা, ছেলেমেয়েরা—সব মিলে প্রায় জন দশেক। তা ছাড়া বুড়ী মা আছে, আছে তিন ভাই।

বুড়ী আতঙ্কে আরো নুয়ে পড়েছে, চাপা গলায় সে বলল, "কি করি? এখন কি করি?"

নিবারণ মাথা নাড়ল, অস্পষ্ট গলায় সে যে বিড়বিড় ক'রে কি বলল তা কিছুই বোঝা গেল না। ছেলেমেয়েগুলো সব চুপচাপ ব'সে আছে। বাইরের কোলাহলের ঢেউ এসে ওদের কানে ধাক্কা দিচ্ছে আর তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে ওদের বিহ্বল ভঙ্গীতে, বিস্ফারিত চোখে, কম্পিত দেহে।

পঞ্চানন আপনমনে বকছিল, "কেনে? কি দোষ করেছি যে আমাদের ওরা মারবে? পাগল—তোমরা সবাই পাগল। আরে, চুপচাপ ব'সে থাক না, আমায় ওরা দেখলেই থেমে যাবে, দেখে নিও—"

গজানন ধমক দিল তাকে, "আরে চুপ কর্ পাগলা কোথাকার—চু-প—"

তেল-চিটচিটে বিছানাটায় গড়িয়ে পড়ল পঞ্চানন, "বেশ, আর কিছুই বলব না আমি—কিচ্ছু না। আমার সব কথাতেই দোষ! কেনে, আমি কি করেছি? না, আমি ম'রে যাব—গলায় দড়ি দেব।"

বউ দুজন ভয়ে কাঁদছে।

গজানন হঠাৎ মাঝের দরজার কাছে এগিয়ে এল, ডাকল, "পরেশবাবু পরেশবাবু—"

সাড়া এল, "কি বলছ ভাই?"

"কি করি বলুন না?"

পরেশবাবুকে দেখা গেল। হতাশায়, ভয়ে তার মুখ অন্ধকার, মাথা নেড়ে সে বলল, "কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই, বুদ্ধিতে কিছুই কুলোচ্ছে না।"

"আজমলের বাড়িতে গিয়ে থাকলে কেমন হয় ?"

"মন্দ না—তাই বলব আজমলকে।"

"বলুন, বলুন ভাই—" গজানন ব্যাকুলভাবে বলল, "আর আমাদের ফেলে যাবেন না এ বিপদে, একা কি করব ?"

পরেশ মাথা নাড়ল, একবার বিষণ্ণ হাসি হাসল, "তা কি আমি বুঝি না গজানন, আমারও তো সমান অবস্থা।"

গোলোকবাবুরা সব থেকে বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। মহা সমুদ্রে ছোট্ট একটা দ্বীপের মত তাঁর বাড়িটায় ব'সে তিনি আর কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না।

গিরিবালা নির্বাক হয়ে ব'সে আছেন। ছেলেমেয়েরাও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। ঘরের ভেতর ভয়াবহ একটা স্তব্ধতা ঘনিয়ে এসেছে, ভারী হয়ে উঠেছে ভৌতিক একটা পরিবেশ। হঠাৎ যেন তাদের আজ মনে হচ্ছে যে, বিংশ শতাব্দীর সভ্য-যুগ এটা নয়, আদিম জগতের অন্ধকার অরণ্য এখনও লুপ্ত হয় নি, মানুষ এখনও গুহাবাসী, বর্বর, মাংসভুক্—যে কোনও মুহূর্তে তারা পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, যে কোন মুহূর্তে তাদের জীবনাবসান হতে পারে।

না, ভুললে চলবে না। পরেশ আছে। খোদার আওয়াজ শুনতে

পাচ্ছে আজমল। ঈশ্বর একজন এবং পৃথিবীর সবাই সেই ঈশ্বরের সন্তান।

"বিবি—"

"জী—"

"পরেশবাবুদের বাড়িতে জায়গা দিতে হবে, নইলে ওরা মারা যাবে।"

"জরুর—জরুর।"

ফতিমা বলল, "ওদের এখুনি হুঁসিয়ার ক'রে দাও আব্বাজান, এখুনি ওদের ডাকো।"

খিড়কির দরজা খুলল আজমল। সামনের দিক দিয়ে গেলে বহু লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে।

ছোট্ট একটা অন্ধ গলি। পরেশের বাড়ির খিড়কির দরজাও তাতে। আবর্জনা ও দুর্গন্ধে ভরপুর।

দরজার আড়ালে সাকিনা, ফতিমা, রোশানারা আর জাহানারা দাঁড়িয়ে আছে। নিরুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে সবাই।

খিড়কির দরজায় করাঘাত করল আজমল। একবার—দুবার—তিনবার।

"পরেশ, পরেশ, ও পরেশ—"

কোনও শব্দ নেই। আরও জোরে ধাক্কা মারল আজমল। কিন্তু বেশি শব্দ করাও বিপজ্জনক, পেছনের বাড়ির লোকেরা হয়তো দেখে ফেলতে পারে।

"পরেশ—ও পরেশ—"

এবার সাড়া পাওয়া গেল, ওপরের একটা জানলা থেকে পরেশ

মুখ বের করল, ভয়ে শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কে ? আজমল ? তোমাকেই খুঁজছি ভাই।"

"শিগ্‌গির চ'লে এসো আমার বাড়িতে।"

"বাঁচালে তুমি আজমল—এই কথাই বলব ভাবছিলাম আমি।"

"দেরি ক'রো না। টাকা পয়সা আর গয়নাগাটি নিয়েই চ'লে এসো। দশ মিনিটের মধ্যে। তা নইলে ওরা এসে পড়বে, লুটপাট আর খুনজখম শুরু হয়ে গেছে।"

"যা বললে তাই করছি—তোমার হাতেই আমাদের ধনপ্রাণ ভাই।"

"আল্লা-হো-আকবর"—উল্লসিত, ক্ষিপ্ত জনতার বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হ'ল।

"শিগগির এসো পরেশ।"

"কিন্তু দোকানঘরের সিন্দুকে যে খরিদ্দারের পঁচিশ ভরি সোনা রয়েছে ভাই ?"

"এখন থাক্, আগে প্রাণ বাঁচাও ভাই। ওরা এলে না হয় আমি বাধা দেব।"

পরেশ ভেতরে গেল।

নিজের বাড়ির খিড়কির দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল আজমল, লক্ষ্য রাখল পরেশের দরজার দিকে।

"গজানন—ও গজানন—" পরেশবাবু উত্তেজিতভাবে ডাকল।

"কি বলছেন ?"

"শিগগির এসো, এক মিনিটও দেরি ক'রো না, আজমল ডাকছে ওদের বাড়িতে যেতে, শিগগির—"

পরেশ আবার ভেতরে ছুটে গেল—নিজের বাড়ির সবাইকে তাগিদ দিতে।

ছেলেমেয়েদের দু-একটা জামা, কিছু খাবার আর কিছু টাকাকড়ি যা ছিল, তা বউ দুজন তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিল।

"ওঠ্, ওঠ্, জামাটা পর্"—ছেলেমেয়েদের বলল তারা।

গজাননের তর সইছে না, "হ'ল ? হ'ল তোমাদের ?"

বুড়ী মিনমিনে গলায় বলল, "থালাবাসনগুলো নিবি নে রে, এ্যাঁ ?"

নিবারণ দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, "থালাবাসনের নিকুচি করেছে—দুত্তোর—"

গজানন চমকে উঠল, "তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি মা ?"

বুড়ী গজগজ করতে লাগল, "কদ্দিনের বাসন—সেই কর্তার আমলের, আমার বাপের দেওয়া, কত সুন্দর বাসন—যাক্, যাক্ গে, কি করব—"

সবাই তাকাল পঞ্চাননের দিকে, "কি রে, তুই যে এখনো শুয়ে আছিস ?"

পঞ্চানন দু'চোখ ঘুরিয়ে মাথা নাড়ল, "শুয়েই থাকব।"

"কেন ?" বিরক্ত হয়ে বলল গজানন।

"এমনি। কে কি করবে আমার ? আমাকে সবাই ভালবাসে।"

এক কোণে একটা লাঠি ছিল, সেটাকে হঠাৎ তুলে নিল গজানন, সগর্জনে বলল, "শালার পাগলাকে আজ মেরেই ফেলব। ওঠ্, ওঠ্ বলছি হারামজাদা, ওঠ্—"

হঠাৎ যেন ভয় পেল পঞ্চানন, তার চোখ-ঘোরানো থেমে গেল, স্থির হয়ে সে তাকাল একবার গজাননের দিকে, তারপরে নিঃশব্দে উঠে দলে ভিড়ল।

"কই হে, এসো শিগগির—"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি"—গজানন সাড়া দিল।

সবাই বেরোল।

পঞ্চানন পেছনে ছিল। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল।

"হা-ম্বা"—ভেতরের বারান্দা থেকে গরুর ডাক ভেসে এল। ওদের একটা গরু আছে, সেটার কথা এতক্ষণ কারো মনে ছিল না।

"থামলি যে পঞ্চা?" গজানন চোখ পাকাল।

"আমি যাব না, না।" হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে পঞ্চানন, এতক্ষণ ওর বিকৃত মস্তিষ্কে যে ঝড় উঠেছিল তা যেন হঠাৎ থেমে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকাল সবার দিকে, "না, আমি যাব না। মুংলী ডাকছে, শুনছ না—"

"শিগগির আয় রে হতভাগা, মুংলী তো আর ম'রে যাবে না, আমরা তো আবার আসব।"—বুড়ী মা মিনতি জানাল।

"না, আমিও মরব না। এতদিন রয়েছি এখানে, সেই জন্ম থেকে মানুষ হলাম এখানে, আজ হঠাৎ পালাব কেন? কে না চেনে আমাকে, কে না ভালবাসে? না, আমার কিছু হবে না—"

"শিগগির আয় বলছি।"—আবার ক্ষেপে উঠল গজানন।

"এলে না তো?" পরেশের ডাক শোনা গেল, "তা হ'লে তোমরা থাক।"

"হা-ম্বা"—গরুটা যেন বুঝতে পেরেছে যে আজ একটা বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে চারদিকে।

"যাও তোমরা, যাও, আমি যাব না, আমার কিছু হবে না, আমায় দেখে তারা নিশ্চয়ই ফিরে যাবে।"

"নিবারণ! গজানন!"—পরেশের ডাক।

"যাচ্ছি, যাচ্ছি পরেশবাবু।"

"যাও।" হঠাৎ সেখান থেকে দৌড়ে ভেতরে চ'লে গেল পঞ্চানন। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গেল।

"থাকগে, মরুকগে, জাহান্নামে যাক।"—গজানন চলতে চলতে বলল।

"ওরে, ও যে র'য়েই গেল।"—বুড়ী কান্নার সুরে বলল।

"থাকুক, ও মরুক।"

আজমলের হৃদ্‌স্পন্দনে যেন ঘড়ির টিক-টিক শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। খোদা, ওদের বাঁচাতে দাও। মালিক, তুমি সবার সুমতি দাও।

এক মিনিট।

পাঁচ মিনিট।

"পরেশ—"

"আসছি—"

সাত মিনিট।

লুণ্ঠনকারী ঘাতকেরা আরো কাছে এসে পড়েছে—"আল্লা হো আকবর"—ঈশ্বরের নাম ক'রেই ওরা এবার পাপ করছে, যেন ঈশ্বরের সমর্থন আছে তাদের পাশবিকতার পেছনে।

দরজার আড়াল থেকে অতি সন্তর্পণে ভয়ার্ত পরেশ মাথা বের করল।

আজমল বেরিয়ে দাঁড়াল, "শিগগির এস।"

একে একে সবাই এল। পরেশ, পরেশের বউ, রোশানারার সমবয়সী এক মেয়ে, বাইশ বছরের একটি ছেলে, পনেরো বছরের একটি ছেলে, একটি সাত বছরের মেয়ে ও তার দোকানের দুজন প্রৌঢ় কর্মকার। এল নিবারণ, গজানন ও তাদের পেছনে তাদের পরিবারের এগারো জন। খোদা, তোমায় অজস্র ধন্যবাদ।

"আল্লা-হো-আকবর"—এবার বাড়ির সামনে এসে জনতা থেমেছে। পরেশের দোকানঘরের দরজায় এবার আঘাত পড়ছে। শাবলের আঘাত ও সম্মিলিত ধাক্কা। মট মট শব্দ উঠছে। দরজা ভেঙে পড়বেই।

সবাইকে ভেতরে নিয়ে একটা ঘরে বসাল আজমল।

"ব'স সবাই, নিশ্চিন্ত হয়ে তোমরা ব'স। ভয় পেয়ো না, আমাকে বিশ্বাস কর।"—সে বলল।

দরজায় ঘা পড়ছে ওদিকে।

আজমল ফিরে দাঁড়াল, বলল, "আসছি এখুনি।"

পরেশ বলল, "কোথাও যাবার দরকার নেই আজমল, তুমি ব'স।"

সাকিনা আড়াল থেকে বলল, "কি হবে মিছিমিছি বাধা দিয়ে? তুমি কি কিছু করতে পারবে?"

পরেশ সায় দিল, "কিছুই করতে পারবে না আজমল, যাক আমার জিনিস, নিক ওরা লুটেপুটে। কিন্তু তুমি যেও না।"

পরেশের স্ত্রী স্বামীকে বলল, "প্রাণ থাকলে সবই হবে, তুমি ওঁকে যেতে নিষেধ কর।"

"আর বিপদের মধ্যে যাবেন না খাঁ সাহেব।"—গজাননও আবেদন জানাল।

কিন্তু আজমল মাথা নাড়ল, "এত মেহনতের জিনিস, দেখিই না একবার।"

কারও কথা শুনল না সে।

যত এগোতে লাগল ততই সে শুনতে পেল লুণ্ঠনের শব্দ। ভাঙছে, ওরা সব কিছু ভেঙে চুরমার করছে। মট্-মট্-মটাস্—দরজা ভেঙে পড়ল। ঝন্-ঝন্ন—ঘড়ি ভেঙে পড়ল। ঠক্-ঠক্ ঠন্-ঠন্—সিন্দুক ভাঙার আওয়াজ আসছে।

"আল্লা-হো আকবর—"

"তোড়ো শালেকো সিন্দুক, জোরসে মারো, হাঁ"—ব্লকের একপাশে ব'সে আকবর নিঃশব্দে দেখছিল সব কিছু।

"ক্যা দেখতা হ্যায় রে?—মুস্তাক হেসে জিজ্ঞেস করল।

"দেখতে হ্যায় কি জেবর অবর কুছ নিকলতা কি নেহি।"

"জরুর নিক্‌লেগা।"

"তবতো শেঠ বনেঙ্গে আজ।"

"হাঁ হাঁ—জরুর—"

আকবর হাসল। আচ্ছা, দেখা যাক। মন্দ কি, সে না নিলে এরাই সব নেবে। তার চেয়ে কিছু নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তা কি নিতে পারবে সে? হঠাৎ সব কিছু কেমন যেন বিস্বাদ মনে হয় তার, সব কিছু ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে হয়। আবার নিজেকে সংযত করে সে। দূর, অত মেজাজ খারাপ করলে কি চলে? দেখা যাক না এরা কতদূর যায়, কাপুরুষের মত পালালে তো চলবে না!

এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল আজমল।

তাজ মহম্মদ সিন্দুক ভাঙার তদারক করছিল, সে তাকে দেখতে পেল।

"তাজ মহম্মদ—" আজমল ডাকল।

"হাঁ জী?"

"এসব কি করছ ভাই?"

"ঠিক কাম হো রহা হ্যায়।"—উদ্ধত ভঙ্গীতে জবাব দিল তাজ মহম্মদ।

ব্যথিতকণ্ঠে বলল আজমল, "ছিঃ ভাই, রোজা ক'রে কোথায় খোদার নাম করবে, না এই সব করছ! তা ছাড়া এরা যে মহল্লার লোক—"

অশ্লীল উক্তি ক'রে তাজ মহম্মদ বলল, "আউর হিন্দুলোগ আপনা মহল্লামে ক্যা কর রহা হ্যায় উস্‌কা খবর হ্যায়? উলোক ভি মুসলমিন লোগোঁকো লুঠ অওর কোতল কর্ রহা হ্যায়? হাম্ কায়র নেহি হ্যায়—হামলোগ আজ দুনিয়াকো দিখলা দেঙ্গে কি হামে পাকিস্তান না দেনেসে হাম ক্যায়সে উস্‌কো লড়কে লে সাক্‌তে হ্যায়—"

"ভাই, খোদাকো ইয়াদ করো, রহম করো অপ্‌না পড়োশী পর—ইয়ে লোগ তো কুছ নেহি কিয়া?"

কঠিনকণ্ঠে তাজ মহম্মদ বলল, "ঘরমে যাও হাজী সাহেব।"

সবাই গ'র্জে বলল, "হাঁ হাঁ, ঘরমে যাইয়ে সাব।"

"নেহি—" আজমল দৃঢ়কণ্ঠে জানাল, "তাজ মহম্মদ, হামারা আরজি মানো ভাই।"

নিঃশব্দে এগিয়ে এল তাজ মহম্মদ, আজমলের ডান হাতটা সজোরে চেপে ধ'রে সে বলল, "এ্যায়সে নেহি মানিয়েগা আপ—"

সজোরে তাকে টানতে টানতে বাড়ীর দরজার সামনে এনে ভেতর দিকে ঠেলে দিয়ে তাজ মহম্মদ বলল, "অন্দর যাকে রোজা মানিয়ে আব—"

জনতা হেসে সায় দিল, "হাঁ সাব, বুড়হা আদ্‌মি, কেঁও তক্‌লিফ করতে হ্যায়!"

"ভাঙ্গো সিন্দুক—অওর অন্দরমে চলো—বাসিন্দেকো লুঠো—" তাজ মহম্মদ হুকুম দিল।

আজমলের চোখে জল এল।

তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আকবর অনুপ্রেরিত হয়ে উঠল, মনঃস্থির করে ফেলল। ধীরে ধীরে যে লোভ ছায়াপাত করছিল তার মনের মধ্যে, তাকে সে মুহূর্তে জয় করল। না, সে আর বিপথে যাবে না। জেলখানার অন্ধকার ঘরে ব'সে যে অনুতাপে জ্বলেছে সে ফল তার কখনো ব্যর্থতায় গিয়ে শেষ হবে না। আর না, লোভ, গুণ্ডামি আর অন্যায়ের ওপর ভিত্তি ক'রে জীবন সার্থক হয় না। নূতন জীবন আরম্ভ করেছে সে—তা থেকে কোনো প্রলোভনই আর তাকে টলাতে পারবে না। থামাতে হবে, এই উন্মত্ত অভিযানকে থামাতে হবে, চীৎকার ক'রে বক্তৃতা দিয়ে সে এই অন্ধ জনগণেশের চৈতন্যোদয় করতে পারবে না। তার জন্যে তাকে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু কি তা? আকবর ভাবতে লাগল। একমনে সে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল। ভাবতে ভাবতে ললাটের দু-পাশের শিরাগুলো তার দপদপ ক'রে লাফাতে লাগল, চোখ ছোট হয়ে এল, ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল।

ওদিকে মস্ত বড় লোহার সিন্দুকটা প্রায় ভাঙতে চলেছে পঁচিশ ভরি সোনা এবার কর্পূরের মত উবে যাবে।

কলুটোলার ওদিকেও সবাই তাণ্ডবে মেতেছে—তাদের কোলাহলের রেশ এদিকেও ভেসে আসছে। চুণাগলি আর সান-ইয়াৎ-সেন লেনেও শান্তি নেই। নেশা—রক্তের নেশাটা সর্বত্র সংক্রামিত হয়েছে।

"হা-ম্বা—"

গরুটা অস্থির হয়ে উঠেছে। বাইরে যে কোলাহল চলছে তা শুনতে পেয়েছে ও, ওর জান্তব চেতনায় রক্তের গন্ধ এসে নাড়া দিয়েছে, আসন্ন একটা বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে দড়ি ছিঁড়ে পালাবার জন্যে সে লাফালাফি করছে।

দুটো চোখ চারদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে পঞ্চানন কাছে এল, "ভয় পাস্ না মুংলী—ভয় পাস্ না। কি করবে ওরা? আমায় ওরা খাতির করে—দেখিস্ 'খন—"

দরজা ভেঙে ফেলে ওরা ভিতরে ঢুকেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল। ওদের দুড়দাড় পায়ের শব্দ শোনা গেল। জিনিসপত্র টেনে ভেঙে ফেলছে ওরা, বিশ্রী কোলাহল করছে, অশ্লীল গালিগালাজ করছে।

মুংলীর দড়িটাতে টান দিল পঞ্চানন, ফিসফিস ক'রে বলল, "শালারা এসে পড়েছে রে মুংলী—চল্, একটু আড়ালে যাই। ওরা কতক্ষণই বা থাকবে, জিনিসপত্র কিছু লুট ক'রে চ'লে গেলেই আমরা আবার বেরিয়ে আসব।"

মুংলীকে টেনে নিয়ে বাথরুমের দিকে গেল পঞ্চানন। বাথরুমের ভেতরে অল্প জায়গা, তারই মধ্যে মুংলীকে ঢুকিয়ে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল পঞ্চানন।

"আল্লা-হো-আকবর"—ওরা একেবারে ভেতরে ঢুকেছে।

"চুপ মুংলী—চুপ, আওয়াজ করিস নে—" দাঁতে দাঁত চেপে বলল পঞ্চানন।

"কোই নেহি হ্যায় ? কোই নেহি ?"—কে যেন বাইরে প্রশ্ন করল।

"কাঁহা ভাগা হ্যায় ? ক্যায়সে ভাগা ?"—আর একজন প্রশ্ন করল

"দেখো—তালাশ করো—"

"মুংলীর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছে, দু' কস বেয়ে একটু একটু ফেণা গড়াচ্ছে, দেহের চামড়া ন'ড়ে উঠছে। হঠাৎ সে ভয়ঙ্কর অস্থির হয়ে উঠল, উত্তেজিত হয়ে উঠল, মাথা নীচু ক'রে ডাক ছাড়ল, "হাম্বা—হা-ম্বা—"

মুহূর্তে ভেতরের কোলাহল থেমে গেল।

স্তব্ধতা।

বাথরুমের দরজায় ধাক্কা পড়ল।

"বন্ধ্ হ্যায়—জরুর ইসমে কোই ছিপা হুয়া হ্যায়—তোড়ো, তোড়ো ইসকো—" সগর্জনে কে যেন আদেশ করল।

দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল।

মট্ মট্ করছে দরজাটা।

শেষে তা ভেঙে পড়ল।

পঞ্চানন সোজা হয়ে দাঁড়াল। সামনেই তাজ মহম্মদ ও মুস্তাক, তাদের পেছনে আকবর।

"হাঃ হাঃ হাঃ—" বাইরের সবাই হেসে উঠল, "শালা গাই লেকে ছিপা হুয়া হ্যায়—"

পঞ্চাননের ছু চোখের তারায় একটা অদ্ভুত দীপ্তি ঘনাল, গম্ভীরকণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, "ক্যা মাংতা হ্যায় তাজ মহম্মদ, এ্যাঁ ?"

তাজ মহম্মদ হেসে বলল, "আপকো শির জনাব।"

"হাঃ হাঃ হাঃ"—জনতা হাসল।

পঞ্চানন হাসল, "ধ্যেৎ, ইয়ার্কি ক'রো না ভাই। মুস্তাক, চুপ ক'রে কেন, আমায় তো তুমি চেন—কেন এমন সব কথা বলছ ভাই ?"

"চোপ্ শালা।"—মুস্তাক ছোরা ওঠাল।

"আমায় মারবে ?" পঞ্চাননের কণ্ঠ হঠাৎ যেন ভারী হয়ে উঠল, "মারো তবে, কিন্তু দোহাই আমার মুংলীকে মেরো না—দোহাই, ওর দুধ খেয়ে দেখো—ভারী মিষ্টি তা—"

কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই তাজ মহম্মদের তলোয়ার শূন্যে উঠল।

হঠাৎ আকবরের কি যেন হ'ল। বুকের ভেতরটায় কেমন যেন খচ ক'রে উঠল। পঞ্চানন পাগলাকে সে কতদিন ধ'রে দেখে এসেছে। সবার সঙ্গে আলাপ লোকটার, পাগল হোক আর যাই হোক সবার সঙ্গেই সে প্রাণ খুলে মেশে, কথা বলে। আজ তার দিকে তাকিয়ে, তার ছুটো ভয়ার্ত চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি দেখে আকবর আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না।

সে বলল, "ইস্‌কো ছোড় দেও তাজ মহম্মদ, ই শালা তো পাগলা হ্যায়।"

কিন্তু ততক্ষণে তাজ মহম্মদের তলোয়ার পঞ্চাননের পাঁজরায় বিঁধে

গিয়েছে, তলোয়ারের অগ্রভাগ বিদ্ধ করতে করতে পঞ্চাননকে একটা দেয়ালে ঠেলে দিয়ে সে বলল, "চোপ্‌ আকবর, জবানকো ঠিক করো, ছুসরি মর্তবা তুমকো মাফ নেহি করেঙ্গে—"

"আ-আ-আ"—পঞ্চানন আর্তনাদ ক'রে থেমে গেল। চিরকালের জন্য। পাগল মানুষ, কারো ভালবাসা পায় নি, স্নেহ পায় নি, সঙের মত জীবনটাকে কাটিয়েছে এতদিন, পৈতৃক ব্যাধির ভারে এতদিনকার অপাংক্তেয় জীবন তার এক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল।

"পাগলা হ্যায় উসে ক্যা? ইয়েহ খেয়াল হ্যায় কি শালা হিন্দু পাগলা হ্যায়?"—তাজ মহম্মদ শ্লেষভরে আকবরের উদ্দেশ্যে বলল।

পঞ্চানন মরল। বেচারা পঞ্চানন। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

মানুষের রক্ত। সেদিকে তাকিয়ে একপা একপা ক'রে পেছনে গিয়ে দাঁড়াল আকবর আর সেই রক্তের ধারা দেখে তার দু চোখও যেন হঠাৎ রক্তাক্ত হয়ে উঠল।

এমনি সময়ে হোসেন এল। বেশ উত্তেজিতভাবে।

তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করল আজমল।

"কেঁও, ক্যা হুয়া?"—হোসেন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

"কুছ নেহি, অন্দর চলো।"

"উঃ, মুসলিম লীগের ক্ষমতা আজ সবাই টের পেয়েছে, সবাই আজ হরতাল করেছে।"

"জোর ক'রে ছুটি দিয়ে হরতাল। আর লুটপাট, খুনখারাপি এই বুঝি লীগের ক্ষমতার পরিচয়? পাকিস্তানের দাবী কি জুলুম ক'রে কখনো স্বীকার করানো যায়?"

হোসেন একটু গম্ভীর হয়ে উঠল, "কিন্তু আমরা এতটা আশা করি নি।"

"তবে?"

"তবে—ওরাই তো দাঙ্গা বাধিয়েছে।"

"ওরা বাধিয়েছে! এ গলিতেও কি ওরা বাধিয়েছে? এই যে পরেশের দোকান লুট হ'ল, এটাও কি ওরই দোষে?"

"এসব সত্যি অন্যায়।"

"পাঁচশো বার অন্যায়, শুধু অন্যায় নয়, এ পাপ। এই সব ক'রে কি কখনো বড় কাজ হয়! এতে সবাই ভাববে যে, বড় কাজের নামে আমরা বুঝি খুন আর লুটপাটই করি।"

গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল হোসেন, "এসব আমরা থামাবই। আজ বিকেলে মিটিং আছে গড়ের মাঠে, মিটিং হ'লেই দেখবেন যে সব থেমে গেছে। আপনি যাবেন না আব্বাজান?"

"না বেটা, বড় দুর্বল মনে হচ্ছে আজ।"

"আমি চললাম, একবার শুধু খবর দিতে এসেছিলাম।"—বুকের ওপরকার কায়েদ-এ-আজম জিন্নার ছবিটাকে ঠিক করতে করতে হোসেন বলল।

"আমার একটা কথা শুনবে?"—যেন ভিক্ষে চাইল আজমল।

"বলুন।"

"আজ মিটিংয়ে না গেলে।"

"কেন?"

"পরেশ ও নিবারণের পরিবারকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। ওদিকে তাজ মহম্মদের দল ওদের বাড়ি লুট করছে, হয়তো তাদের জন্য এদিকে আসতে পারে। আমি একা, তাই তোমায় থাকতে বলছি।"

হঠাৎ হোসেন উত্তেজিত হয়ে উঠল; "কেন আপনি ওদের জায়গা দিলেন আব্বাজান? হিন্দুরা এতদিন যা করেছে তার শাস্তি তাদের অনেকে পাবেই। তাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই নির্দোষ, কিন্তু কে বিচার করবে তা? তা ছাড়া ওদের আশ্রয় দিয়ে জাতভাইদের রাগকে কি বাড়ানো উচিত?"

"খোদার পুকার শুনে স্থির থাকতে পারি নি বেটা। তা ছাড়া ওরা বেকসুর পড়োশী—"

"না, এ আপনার অন্যায় হয়েছে আব্বাজান।"

"কি বললি?" হঠাৎ ক্রোধে, বেদনায় আরও খাড়া হয়ে উঠল আজমল, বলল, "অন্যায়!"

ছেলের হাত ধ'রে সে উত্তেজনায় কম্পিতকণ্ঠে বলল, "আমার সঙ্গে আয় দেখি—আয়।"

হোসেন একটু বিস্মিত হ'ল, খানিকটা অনুতাপও হ'ল তার। বাপের মুখের ওপর এর আগে আর কোনদিন সে কড়া কথা বলে নি।

ছেলেকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল আজমল। বিস্মিতনেত্রে সবাই তাকাল তাদের দিকে। সাকিনা এগিয়ে এল কাছে।

কিন্তু কারও দিকে তাকাল না আজমল। তাকের ওপর রক্ষিত

কোরাণটা তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে সে কয়েকটা পাতা উল্‌টে গেল। তারপরে আবেগরুদ্ধকণ্ঠে সুরাহোজেরাত অধ্যায়ের প্রথম রুকু সে সুর ক'রে পড়তে লাগল। সে যা পড়ল তার অর্থ এই: 'হে মুসলমানগণ, যখন কোন দুষ্টপ্রকৃতি লোক তোমাদের নিকট কোন সংবাদ উপস্থাপিত করে, তখন ধৈর্য, বিজ্ঞতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে তার সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চেষ্টা করবে এবং মূর্খতাবশতঃ কোনও সম্প্রদায়ের অনিষ্ট ক'রো না, সেরূপ করলে পরিণামে তোমাদের লজ্জিত হয়ে পস্তাতে হবে।'

হোসেন মাথা নীচু করল।

আজমল রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "এবার? এবার কি বলবি বেটা? খোদাহ্‌তালার নির্দেশ অনুযায়ী কি তোদের কাজ হচ্ছে? আর কায়েদ-এ-আজমও তো শান্তিপূর্ণভাবেই আন্দোলন চালাতে বলেছেন। নেতাদেরই যদি না মানো, তবে কেন তোমাদের এই ভড়ং?"

হোসেন নরম গলায় বলল, "কিন্তু লীগের লোকেরা তো এই সব মারামারি করছে না।"

"তা হ'লে কি ক'রে দাবি কর যে ভারতের সমস্ত মুসলমান লীগের কর্তৃত্ব মানে? যদি তাই হয় তবে যাও, থামাও এই দাঙ্গা, ন্যায়ের পথে আন্দোলনকে নিয়ে যাও।"

ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে হোসেন বলল, "আপনার কথায় যুক্তি আছে আব্বাজান। আমি সেই চেষ্টাই করতে যাচ্ছি, কিন্তু আপাততঃ ওদের আশ্রয় দিয়ে নিজেদেরও বিপন্ন ক'রে তুলেছেন আপনি।"

সাকিনা তিরস্কার ক'রে বলল, "ছিঃ হোসেন, ধর্মের কাজ করতে

কাপুরুষ হ'য়ো না। মানুষকে আশ্রয় দেওয়া আর তাদের প্রাণ বাঁচানোর চেয়ে মহত্তর কাজ আর কি আছে ?"

আজমল ছেলের হাত ধরল, যেন ঈশ্বরের বৈদ্যুতিক স্পর্শে অনুপ্রাণিত ও মুখর হয়ে উঠল সে, "বেটা, ষাটের কাছাকাছি বয়স হয়েছে, আমার দিকে চেয়ে দেখ্। দেখ্ এই পাকা চুল, অভিজ্ঞতার এই সুগভীর রেখাগুলো, মনে ক'রে দেখ্ যে সারা জীবন ধ'রে খোদার হুকুম মত জীবনযাপন করেছি আমি, তাঁর দরবারে হাজিরা দিয়ে জীবনকে নূতন ক'রে দেখার মত সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সারা জীবন ধ'রে, সব কিছুর ভেতর দিয়ে ইসলামের এই শিক্ষাই আমি পেয়েছি যে, সব মানুষ ভাই ভাই, দুশমন সে-ই যে খোদার আদেশ অমান্য করে, যে মানুষের ক্ষতি করে। এর পর জবাব দে যে, আমি অন্যায় করেছি কি ন্যায় করেছি !"

ধরা গলায় হোসেন বলল, "আমায় মাফ করুন আব্বাজান, আমার কর্তব্য আমি বুঝতে পারছি।"—ব'লেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন তার ডাগর ডাগর চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করছে।

ওদিকে পরেশ, নিবারণ এবং তাদের পরিবার ভেতরের ঘরের এক কোণে জড়সড় হয়ে ব'সে আছে। সিন্দুক ভাঙার শব্দ, তাদের ওপরতলার ঘরের জিনিসপত্র লুটপাট করার শব্দ, চেয়ার টেবিল আলমারী চুরমার করার আওয়াজ তারা শুনতে পেয়েছিল। তিল তিল ক'রে, দেহের রক্তকে জল ক'রে যে সংসারকে তারা গ'ড়ে তুলেছিল, স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে যে সংসারকে দিন দিন পরিবর্ধিত করেছিল, তা আজ এক মুহূর্তে চূর্ণীকৃত হ'ল। হোক, যাক সব কিছু, কিন্তু প্রাণটা যেন থাকে।

হঠাৎ চমকে উঠল সবাই, পরেশের দোতলার ঘরের জানলা থেকে তাজ মহম্মদ ডাকছে, "হাজী সাহেব, এ হাজী সাহেব—"

আজমল ভেতরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, "কি চাও ?"

তাজ মহম্মদ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "ইস্ মকানকা হিন্দুলোগ কাঁহা গিয়া হ্যায় ?"

একটুও দ্বিধা না ক'রে আজমল জবাব দিল, "আমি জানি না।"

তাজ মহম্মদ যেন কথাটাকে বিশ্বাস করল না, কটমট ক'রে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে সে খানিকক্ষণ আজমলের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অর্ধ-স্বগতোক্তি করল, "লেকিন যায়েগা কাঁহা ? আচ্ছা, বাহার করেঙ্গে, ঢুঁর লেঙ্গে—"

ভেতরে বাইরে লুণ্ঠনকারীরা সমানে গর্জন করছে।

মিথ্যে কথা বলল আজমল। হজযাত্রার পর থেকে সে অজ্ঞাতেও মিথ্যে কথা বলে নি, কিন্তু আজ সজ্ঞানেই সে মিথ্যে কথা বলল।

বেলা প'ড়ে আসছে। আকাশটা ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে উঠছে। আসুক বৃষ্টি, আসুক ঝড়, খোদার অভিশাপ আজ শতমুখী হয়েই নেমে আসুক। আজমলের তাতে কোন দুঃখ নেই।

"আল্লা-হো-আকবর—"

উন্মত্ত জনতার গর্জন ভেসে আসছে—বোধ হয় কলুটোলা, চুণাগলি ও চিৎপুর থেকে।

রাস্তা দিয়ে কারা যেন দ্রুত দৌড়ে গেল।

"মারো শালে লোগকো, পাকিস্তান কায়েম করো—"

"আঃ—আঃ—আঃ—"

আর্তনাদ।

ফিয়ার্স লেনের কালো পথে রক্ত ব'য়ে যাচ্ছে।

ঘরের ভেতর পরেশ ওরা চুপ ক'রে ব'সে আছে।

"ভগবানকে ডাক, ভেবো না"—সাত বছরের মেয়েটাকে বুকে চেপে ধ'রে পরেশের স্ত্রী নিবারণ ও গজাননের বউদের সান্ত্বনা দিল।

ভোঁদড় বিরক্তি বোধ করছিল ব'সে থাকতে থাকতে, তার গায়ে তার বোন মীনা একটু হেলান দিতেই সে তাকে একটা চিমটি কেটে দিল।

মীনা কাঁদবার উপক্রম করল।

কিন্তু তার আগেই গজানন মেয়ের মুখে হাত চাপা দিল, "চুপ, কাঁদবি না, কাঁদলেই ওরা এসে মেরে ফেলবে, চুপ।" মীনা থামল।

তখন ছেলের কান ধ'রে ক'ষে ম'লে দিল গজানন।

"উঃ, লাগে।"—ভোঁদড় বলল।

"চুপ।"

"বাঃ, মারছ কেন ?"—ক্ষীণকণ্ঠে জানাল ভোঁদড়।

সত্তর বছরের বুড়ী ধনুকের মত বাঁকা পিঠটাকে একটু সোজা ক'রে সবাইকে বলল, "ঠাকুরকে ডাক বাবা, ঠাকুরকে ডাক ?"

ঠোঁট নেড়ে সবাই চেষ্টা করে ভগবানকে ডাকতে। কিন্তু আতঙ্কে, ভয়ে, শরীরের রক্ত-চলাচল বোধ হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই কারও ঠোঁট নড়ল না। কবরের নীচেকার প্রেতের মত ওদের মুখে শুধু একটা বিবর্ণ ছায়াই ঘনিয়ে এল।

নামাজ পড়ার সময় হয়েছে।

আজমল নামাজ পড়তে বসল। ঈশ্বর, তোমার রাজ্যে আজ বিভীষিকা নেমে এসেছে, আজ শয়তানই সেখানকার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে মনে সন্দেহ জাগছে যে তুমি বুঝি একটা উপকথা। কিন্তু অবিশ্বাসীরা যে যাই বলুক না কেন, এটা ঠিক যে, তুমি আছ, প্রতি মুহূর্তে আমাদের রক্তের তালে তালে তোমারই জয়গাথা ঘোষিত হচ্ছে। তুমি দৃষ্টি ফেরাও, হস্তক্ষেপ কর, শয়তানের লীলাকে বন্ধ কর।

"মারো শালে লোগকো—মারকে উন্‌হে সবক্ শিখলাও—"

একটা কোলাহল।

বারান্দায় গেল আজমল।

ফিয়ার্স লেনের জন পাঁচেক দর্জি ও বিড়ি-শ্রমিক। তাদের একজনের হাতে একটা কাস্তে-হাতুড়ি-ওয়ালা লাল ঝাণ্ডা। পাড়ার অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা তাদের ঘিরে আছে।

একজন শ্রমিক জনতাকে বোঝাচ্ছিল, "আখের ইস্‌মে ফয়দা কিস্‌কো? আংরেজকো। হিন্দু মুসলমানকো তো একসাথ রহনেহি পড়েগা, তব কিঁউ ইয়ে লড়াই ভাই সব? ইস্‌মে হামারি তাকত ঘাটেগা, লেকিন আংরেজলোগ হাজার গুণা তাকতমন্দ্ বনেগা—"

তাকে আর কেউ কথা শেষ করতে দিল না। তাদের প্রত্যেকেরই চুলের ঝুঁটি ধ'রে অজস্র কিলচড় বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। একজন লাল ঝাণ্ডাটা কেড়ে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মশালের মত তুলে ধরল।

"হাঃ হাঃ হাঃ—" হাসির রোল উঠল।

একজন শায়েস্তাকারী ছোরা বের ক'রে শ্রমিকদের বলল, "বোল্ শালে—পাকিস্তান জিন্দাবাদ—বোল্, না তো ভোঁক্ দেঙ্গে।"

ভয়ের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে ওদের মুখমণ্ডলে। ওরা প্রথমে জবাব দিল না, মনের ভিতরকার বিবেক ওদের দংশন করছে।

আবার কিল, চড়, লাথি।

"বোল্ শালে—"

"পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

"বোল্—কায়েদ-এ-আজম জিন্দাবাদ—"

"কায়েদ-এ-আজম জিন্দাবাদ।"

তাই বলল তারা। হঠাৎ বাঁচবার লোভ তাদের দুর্নিবার হয়ে উঠেছে।

ওরা বুঝতে পেরেছে যে, এরা অন্ধ, অমানুষ, মানব-সমাজের নিয়তি এরা জানে না ব'লেই আজ এমন উন্মত্ত ও রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছে, এদের এখন কিছুই বোঝানো যাবে না।

"ভাগ্—মুসলমিন বোল্কে অওর কাংগ্রেসী নেহি হ্যায় বোল্কে আজ তে সব জিন্দা রহা—ভাগ্—"

শ্রমিক পাঁচজন দৌড়ে পালাল।

দুই ছাদের উপর ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল। একদৃষ্টে ওরা পরস্পরকে নিরীক্ষণ করছিল। যেন শেষবারের মত ওরা পরস্পরকে দেখে নিচ্ছে। চারদিকে যে ধ্বংস-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে

হয়তো যে কোন মুহূর্তে আজ ওদের প্রাণও আহুতি যোগাবে। কে জানে!

"সুনন্দা, ভয় পেয়ো না।"—অজিত বলল।

সুনন্দা হাসল, তার সুগৌর মুখের ওপর মেঘাবৃত অস্তগামী সূর্যের ম্লান, রাঙা আলো। বোঝা যাচ্ছে যে ভয় ও উৎকণ্ঠায় তার মুখ পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। তবু একটা অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য ওর চোখে চক্‌চক্‌ করছে, একটা অপরূপ প্রশান্তি ওর দেহে আত্মপ্রকাশ করছে।

"ভয়!" সুনন্দা হাসল, "না, ভয় কি! আমি তো খুশীই হয়েছি, ভগবানকে আমি তো ধন্যবাদই জানাচ্ছি এর জন্য। শেকল ছিঁড়তে পারছিলাম না, ভয় আর লজ্জাকে জয় করতে পারছিলাম না, তোমাকে হারাবার বেদনাও আমার স'য়ে আসছিল। কিন্তু লাগল এই লড়াই—আজকের মত আমার তো নিষ্কৃতি হ'ল, আজ তো আর বিয়ে হবে না। অজিতদা—অজিতদা—"

"কি?"

"তেমন বিপদ আসলে তুমি আমায় তোমার পায়ে মাথা রেখে মরতে দিও, আমার শেষ সময়ে যেন তুমি কাছে থেকো।"

অজিত হাসল, "তুমি পাগল সুনন্দা, তুমি পাগল। তোমার কাছে যাবার মত শক্তি যদি আমার থাকে তবে যাব বৈকি। থাক্‌, ওসব কথা থাক্‌। ভয় পেয়ো না, ভিতরে যাও। যা হবার হবে, এখন ভেবে লাভ নেই। যে রাষ্ট্র-বিপ্লব আরম্ভ হ'ল তাতে তোমার আমার অবস্থা এক—আলাদা নয়।"

তবু সুনন্দা ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, তেমনিভাবে নিজের

অপরূপ সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য নিয়ে ক্ষণকাল অজিতের দিকে নিষ্পলক-নেত্রে তাকিয়ে রইল, নড়ল না।

"হিন্দু মুসলিম এক হো—"

একটা ট্রাকে গোটা দশেক হিন্দু মুসলমান কংগ্রেস ও লীগ পতাকা উড়িয়ে সাগর দত্ত লেন দিয়ে এসে ফিয়ার্স লেনের মুখে থেমে পড়ল।

"মারো শালে লোগকো—মারো—"

এদিক ওদিক থেকে মুহূর্তে অনেক লোক জড় হ'ল।

একজন মুসলমান ট্রাকের ওপর থেকে বলল, "ভাই সব, ঠাণ্ডা হও—হিংসার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে মেরো না। ভাই সব, কার বিরুদ্ধে লড়াই করছ তোমরা, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই লড়ছ? এ যে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। এতে আমাদের কোনও লাভ নেই, এতে আমাদের পরাধীনতার মিয়াদ আরও বেড়ে যাবে, এতে শুধু ইংরেজ বণিকই লাভবান হবে—"

"নেহি শুননে মাংতা—মারো সবকো"—জনতার অন্ধ ক্রোধ সশব্দ হয়ে উঠল।

"শালা হিন্দুলোগ কিৎনা মুসলমিনকো মার ডালা—ইয়ে খবর মালুম হ্যায়?"

"মারো—ভাগাও—"

"ভাই সব—" তবু সেই বক্তা বলতে চাইল।

লাঠি, ইঁট, বোতল নিক্ষিপ্ত হ'ল। বক্তাটির মাথা ফেটে চোখের ওপর দিয়ে রক্তের স্রোত নামল।

তবু সে আবার বলতে গেল, "ভাই সব—"

কিন্তু কথা শেষ হ'ল না। সুদক্ষ ড্রাইভার হঠাৎ গাড়িটাকে সবেগে পেছন দিকে চালাল।

"আরে, ভাগতা হ্যায়—মারো—মারো সবকো—"

জনতা মোটরকে ধাওয়া করল।

ওদিকে বৃষ্টি সুরু হয়েছে, সন্ধ্যা ঘনাল। রোজা খুলবার সময়। জুম্মাবারের রোজা। হিংসা আর রক্তের আগুনে তার পবিত্রতা আজ কলুষিত হয়ে উঠেছে।

আজমল ভাবে। মুসলমানপাড়ায় এই ব্যাপার চলছে। হিন্দু-পাড়াতেও নিশ্চয়ই এমনি হচ্ছে। গুজব অতিরঞ্জিত হয়ে যখন হিন্দু-পাড়ায় পৌঁছুবে, তখন সেখানকার মুসলমানদের আরও না জানি কি হবে? কে বাঁচাবে তাদের? কেউ কি বাঁচাবে না? কেউ না?

মাথা নাড়ে আজমল। না। যেমন এই ফিয়ার্স লেনে ভাল মানুষ আছে, তেমনি হিন্দুপাড়াতেও কি ভাল মানুষ নেই? সভ্যতা আর মানবতা কি লুপ্ত হয়ে গেছে? ঈশ্বরের রাজ্য থেকে মহৎপ্রাণেরা কি সবাই আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে? না, না। বহুদিনের হিংসা আর অবিশ্বাসজনিত পাপের ফলভোগই সবাই করছে, আর কিছু নয়। ভেদাভেদ একদিন শেষ হবেই, আবার কোলাকুলি হবে, হিন্দু মুসলমান 'ভাই ভাই' ব'লে হাত মেলাবে। না, ভয় নেই। খোদা আছেন।

রাত হয়েছে। এক পশলা জোর বৃষ্টিপাতের পর এখন টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে।

পরেশদের চোখে কৃতজ্ঞতায় জল এল।

আজমল বলল, "তোমরা লজ্জা ক'রো না ভাই, নাও, চাল ডাল রাঁধ, পেট ভ'রে খাও। অবস্থা বুঝে পরে ব্যবস্থা করব, এখন আরাম কর, এ বাড়িকে নিজেদের ব'লে ভাব।"

পরেশ বলল, "আর-জন্মে তুমি আমার কে ছিলে ভাই?"

আজমল হাসল, "জন্মান্তরবাদে আমরা বিশ্বাস করি না পরেশ। তবু বলছি—আমি তোমাদের ভাই ছিলাম।"

সত্তর বছরের বুড়ীর ধনুকের মত পিঠটাকে আবার সোজা হ'তে দেখা গেল, ডান হাতটা তুলে সে বলল, "আর তোরা সবাই আমার ছেলে—আমার রক্তমাংস—তোদের কল্যাণ হোক—"

পরেশের স্ত্রী আঁচল দিয়ে চোখ মুছল।

কিন্তু ছেলেমেয়েগুলির মনে আতঙ্ক আর ভয় ঢুকেছে, আশঙ্কায় ওদের হৃদ্স্পন্দন বিকারগ্রস্তের মত হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণের জন্য ফিয়ার্স লেনে অবসাদ দেখা দিল। সবাই রোজা ভাঙছে।

হোসেনের পায়ের আওয়াজ।

ঘরে ঢুকল সে। তার সার্টের হাত ছেঁড়া, চুল অবিন্যস্ত।

"কি হয়েছে বেটা?" আজমল শঙ্কিত হ'ল।

হোসেন বিষাদের হাসি হেসে জবাব দিল, "হ'ল না আব্বাজান—শান্তিপ্রচেষ্টার কথা বলতে গিয়ে মার খেয়ে এলাম। আমি, বসির চাচা, মিঞা জাফরুল্লা, খালেক মিঞা—সবাই মিলে তাজ মহম্মদ আর ওপাড়ার লোকদের মানা করতে গিয়েছিলাম—কিন্তু হ'ল না, ওরা

আমাদের নাগালের বাইরে চ'লে গেছে, হিংসা আর লোভে ওরা সব কিছু বিলকুল ভুলে গেছে—"

ঠক্-ঠক্-ঠক্। বহির্দ্বারে করাঘাত।

দরজা খোলা হ'ল। একজন দাসীজাতীয়া স্ত্রীলোক এল।

"কি চাই?" হোসেন প্রশ্ন করল।

"আবদুল্লা সাহেবের বিবি চিঠি পাঠিয়েছে—সাকিনা বিবির কাছে।"

"কি দরকার?"

"তাকেই বলব।"

দাসীটা ওপরে গেল। যাবার সময় এদিক ওদিক সে কি যেন খুঁজতে থাকে।

সাকিনা এসে সামনে দাঁড়াল।

"কি চাই?"

"আপনাদের কাছে আণ্ডা আছে—চারটে? বিবি চাইছে—"

"রোশানারা—"

রোশানারা চারটে ডিম নিয়ে এল।

কিন্তু ডিম পেয়েও দাসীটি নড়বার লক্ষণ দেখায় না, এদিক ওদিক এবং বড় ঘরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে সে মৃদু হেসে প্রশ্ন করল, "ওই ঘরে কে বিবি সাহেব, বাহারকা আদমি?"

সাকিনার চোখ জ্ব'লে উঠল, "কেউ নেই ওঘরে—আর অত খবরে কি দরকার তোমার? ডিম পেয়েছ, এবার যাও—"

"জী—"

দাসী দ্রুতপদে নীচে নেমে গেল।

হোসেন দরজা বন্ধ ক'রে এল।

সাকিনা বলল, "দরজা আর খুলিস না হোসেন।"

আজমল বারান্দায় ছিল, প্রশ্ন করল, "কেন বিবি?"

"ওরা আমাদের বাড়ির ওপর নজর রেখেছে, হুঁসিয়ার—"

"কি ক'রে বুঝলে?" আজমল এগিয়ে এল।

"এই মেয়েলোকটা মিথ্যে অজুহাতে জানতে এসেছিল যে, এখানে পরেশবাবুদের আমরা লুকিয়ে রেখেছি কি না!"

"বটে!" আজমল চিন্তাকুল হয়ে উঠল।

সন্ধ্যা গাঢ় হচ্ছে ফিয়ার্স লেনে, গ্যাসের বাতিগুলো জ্ব'লে উঠেছে। ধীরে ধীরে একজন দুজন ক'রে লুণ্ঠনকারীদের আবার দেখা যাচ্ছে, বীভৎসতার ছায়া ঘনাচ্ছে চারদিকে। রোজা ভেঙেছে গুণ্ডারা। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে, দেহে ও মনে নূতন শক্তির জোয়ার এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে হিংসা ও লোভ আরও প্রবল, আরও প্রখর হয়ে উঠেছে। ধারালো ছোরাতে যেন আবার শান পড়েছে।

হোসেন ব'সে ভাবছিল।

জাহানারা কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল, "কি অত ভাবছ বল তো—কি ভাবছ?"

"একটা লজ্জার কথা ভাবছি জাহানারা—" হোসেন মুখ তুলল। চিন্তায় তা অন্ধকার হয়ে উঠেছে, তার পরিষ্কার ও চওড়া ললাটে অনেক ভাবনার ইতিহাস রেখান্বিত হয়ে উঠেছে।

"লজ্জার কথা? মানে?" জাহানারা বুঝতে চেষ্টা ক'রেও বুঝতে পারল না।

"যে আন্দোলনকে শুরু করেছিলাম তা যে এমনি রূপ ধারণ করবে তা জানতাম না। এখন দেখছি যে একে থামাবার ক্ষমতা নেই আমাদের—এ কি কম লজ্জার কথা?"

স্বামীর পাশে ব'সে জাহানারা একটা হাত রাখল তার পিঠে। কোন কিছু বলার মত কথা সে খুঁজে পেল না।

রাত দশটা।

এবার কোলাহল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবার দল আরও পুষ্ট ও প্রবল হয়েছে। 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি ক্রমেই ভয়াবহভাবে নিকটে এগিয়ে আসছে। আর বহু দূরবর্তী জায়গা থেকেও কোলাহল ও আর্তনাদ-মিশ্রিত একটা ধ্বনি আসছে।

"আল্লা-হো-আকবর—"

কলুটোলার দিক থেকে একটা দল এল। তাদের সঙ্গে মশাল ও ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা। সাড়ম্বরে সবাই শত্রু-ধ্বংস করতে বেরিয়েছে। মশালের কম্পিত আলোকে ছোরা, তলোয়ার আর তেল-চক্চকে লাঠিগুলো ঝক্ঝক্ ক'রে ওঠে।

"মারো, দুশমনোঁকো মারো, মুস্লিম লোগোকো আজাদ করো।"

জনতা এগিয়ে গেল। ফিয়ার্স লেন ও তৎসংলগ্ন সমস্ত গলির হিন্দুদের তারা শাস্তি দেবে। উৎকট উল্লাসে, মদমত্তের মত পা ফেলে,

ছোরা তলোয়ার আর লাঠি ঘুরিয়ে তারা এগিয়ে চলল। তাদের অগ্রভাগে তাজ মহম্মদ। তার তলোয়ারের মুখে একটি রক্তাক্ত মাংস-পিণ্ড। ভালভাবে তাকাতেই বোঝা গেল যে, তা একটি কর্তিত স্তন—হয়তো কোন কুমারীর যৌবন-গর্ব কিংবা কোন শিশুর লোভের আধার। তার দিকে মাঝে মাঝে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে লোকেরা হা-হা শব্দে হেসে উঠছে। রমণীর মান অন্তর্হিত হয়েছে, সাম্প্রদায়িক বিষ-বন্যায় আজ সমস্ত নীতিই ভেসে গেছে। শুধু আছে আদিম পঙ্কিল প্রবৃত্তি। খুন কর, লুটে নাও। ভালবাসা দিয়ে নয়, ধারালো অস্ত্রে শত্রুকে বশ কর। আর শত্রু কে? ভাই—আপন ভাই।

আজমল কোরাণ পড়ছিল। কিন্তু আজ তার একাগ্রতা নেই, বারংবার তা ঠুন্‌কো কাঁচের মত ভেঙে যাচ্ছে।

ওদিকে পরেশ আর তার পরিবার। নিবারণ, গজানন এবং তাদের মা বউ ছেলেমেয়ে। বলির পশুর মত সবাই কাঁপছে।

সাত বছরের মেয়েটা একটু ন'ড়ে উঠল।

পরেশের স্ত্রী মেয়েটার হাত ক'ষে চেপে ধরল। মেয়েটা একটু বেদনার্ত শব্দ তুলল।

পরেশ বাতাসে হাত আন্দোলিত ক'রে, চোখ রাঙিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে এল, ফিস্‌ফিস্ ক'রে শাসিয়ে বলল, "চুপ, চুপ,—নইলে মেরে লাশ ক'রে ফেলব।"

ওরা সবাই চুপ ক'রে ব'সে আছে, জীবন্মৃতের মত ঝিমোচ্ছে। রূপ,

রস, গন্ধ, বর্ণের পৃথিবী, আলোকোজ্জ্বল ও হাস্যোচ্ছল মহানগরী আজ অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

"আল্লা-হো-আকবর—"

কিন্তু এ জয়ধ্বনি ঈশ্বরের নয়। এ আস্তিকের ধ্বনি নয়, নাস্তিকের। যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে সে কতকগুলি মানবতার নীতিকেও বিশ্বাস করতে বাধ্য।

"আ—আ—আঃ—" উড়িয়াদের বস্তি থেকে আওয়াজ আসছে।

নিরীহ উড়িয়া শ্রমজীবীরা। দিন আনে দিন খায় তারা। কারও বা পুরানো বস্তার আড়ৎ আছে। মাতৃভূমি থেকে দূরে, মহানগরীর এক কোণে অস্থায়ী বাসা গ'ড়ে তুলেছিল ওরা। নিজেদের ছোট স্বার্থ আর ছোট জীবনের গণ্ডির বাইরেকার আর কোন খবরই ওরা জানত না। আজ হঠাৎ মধ্যযুগীয় বর্বরতার আগুনে ওরা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। চাপ চাপ রক্তের লেখায় তাদের অতি তুচ্ছ জীবনেতিহাস আজ সমাপ্তি লাভ করল।

দরজা ভাঙছে, জানলা ভাঙছে। শাবলের আঘাত। অজস্র পদক্ষেপ। যেন উন্মত্ত বন্যহস্তীর দল অরণ্যকে তোলপাড় করছে।

কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। নারীকণ্ঠ, শিশুকণ্ঠ ও আহতদের আর্তনাদ গুমরে গুমরে উঠছে।

রাস্তা দিয়ে কারা যেন পালাচ্ছে! কারা যেন পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করছে!

বুড়ো লিনটিং হঠাৎ ভয় পেয়েছে। দরজা জানলা বন্ধ ক'রে সে

ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে ভাঙা এক টেবিলের ওপর শ্বেতপাথরের ছোট্ট একটা বুদ্ধমূর্তি। মূর্তির পেছনে চীনা হরফে জ্যোতির্মণ্ডলে লিখিত আছে—'অহিংসা পরম ধর্ম।'

একটা মোমবাতি বের ক'রে মূর্তির সামনে জ্বালিয়ে দিল লিনটিং। ক্ষণকাল সে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তার ঠোঁটের কোণে এক বিচিত্র হাসি। মমির মত তার বলিচিহ্নাঙ্কিত ও জরাজর্জর মুখমণ্ডলে একটা অপরূপ বেদনার গাম্ভীর্য। চামড়ার ভাঁজে আর ঝুলে-পড়া ভুরুর নীচেকার অদৃশ্যপ্রায় খুদে খুদে চোখে তার বাষ্পের গাঢ়তা।

হঠাৎ হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল সে, হাতজোড় ক'রে মূর্তির সামনে মাথা নীচু করল। ভাঙা পুরোনো চীনা রেকর্ড বাজাবার নেশাটা আজ তার হঠাৎ উড়ে গিয়েছে।

ওদিকে আজমল সান্ত্বনা দেয়, "ঘাবড়ো না নিবারণ, ভয় পেয়ো না পরেশ, আমি—আমি আছি আর আমার উপরে খোদা আছেন।"

তবু ভয় হয়, ভাবনা হয়, আতঙ্কের বন্যায় দু'চোখের তারা বেরিয়ে আসবার উপক্রম করে।

হঠাৎ পরেশের ঘরের অন্ধকার জানলার দিকে নজর পড়ল। চকিতে কারা যেন স'রে গেল সেখান থেকে।

এ কি ভুল?

না, না, ভুল না, বয়সের ভারে তার দৃষ্টি দুর্বল হয় নি, আজমল ঠিকই দেখেছে। দুটো মুখ। দুটো মানুষ ছিল ওই জানলার আড়ালে।

সবাই শেষ হয়েছে। সুনন্দার বাবা, মা, মাসী, পিসী, মামী, ওবাড়ির আর সবাই শেষ হয়েছে, রক্তের বন্যায় তাদের সমাপ্তি এসেছে।

লুণ্ঠনকারী ঘাতকেরা সুনন্দার দিকে তাকাল।

আকবরও তাকাল তার দিকে। হঠাৎ তার চেতনা স্তিমিত হয়ে এল। এ কি রূপ! সত্য না মিথ্যা! সুনন্দার গা থেকে গয়নাগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার কান থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। তার চুল এলিয়ে পড়েছে পিঠে, তার শাড়ি অন্তর্হিত, পেটিকোটটাও ফালি ফালি হয়ে গেছে, ব্লাউজটা ঝুলছে কোমরের দিকে। দু হাতে বুক চেপে ধ'রে সে আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখ মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, প্রতীক্ষা করছে যবনিকাপাতের জন্য।

তাজ মহম্মদ আদেশ করল, "কাটো ইস্‌কো ভি—"

হঠাৎ মুস্তাক কি যেন বলল তার কানে কানে।

তাজ মহম্মদ হাসল, এগিয়ে গেল সুনন্দার দিকে, তার একটা হাত মুচড়ে নীচে নামাল, পরে হেসে বলল, "হাঁ, মাল আচ্ছা হ্যায়—"

মুস্তাক আকবরের পাশে এল, বলল, "কি রে, চাই ?"

বহুদিনের অতৃপ্ত কামনা হঠাৎ আকবরকে বেসামাল ক'রে দিল। লুণ্ঠন করে নি সে, কারও বুকে ছোরা বসায় নি। এখনও পর্যন্ত নিজেকে সে সংযত রেখেছিল, কিন্তু আর সে পারল না। বন্য পশুর মত তার

অবদমিত রক্তমাংসের চাহিদাটা হঠাৎ এই রূপসী মেয়েটিকে দেখে দাবানলের মত চেতনায় বিস্তৃত হ'ল।

মাথা নেড়ে উষ্ণ নিঃশ্বাস ছাড়ল সে, "চাই—চাই—"

তাজ মহম্মদ সুনন্দাকে ঠেলে দিল তাদের দিকে "লে যাও—বে। খাইস করো, লেকিন উস্‌কা বাদ খতম্ কর্ দেও গে—"

. মুস্তাক সুনন্দাকে বুকে টেনে নিল, পাঁজাকোলা ক'রে তাকে তুলে ধরল। মুহূর্তে আরও সাত-আটজন নামজাদা গুণ্ডা তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

"হাম্‌লোগকো ভি হিস্‌সা চাহিয়ে—সমঝা?"

তাজ মহম্মদ হাসল, "হাঁ হাঁ, সব শালা যাও—"

আকবর জ্বরগ্রস্তের মত তাদের অনুসরণ করল।

তাজ মহম্মদ বাকী সবাইকে আদেশ করল, "চলো, অব বগলওয়ালা কোঠীমে চলো, চলো সব—"

ওরা কোলাহল করতে করতে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভেতরের একটা ঘরে গিয়ে হাজির হ'ল মুস্তাকের দল।

ক্ষণকালের জন্য আকবর সুনন্দার মুখকে দেখতে পেল। চোখ বুজে আছে সে, বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে তার মুখে, প্রাণহীনের মত হাত-পা তার ঝুলছে মুস্তাকের কোলে।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ পরে মুস্তাক এসে তাকে বলল, "আব যা ওস্তাদ, এবার তুই। আর শোন্, আমরা পাশের বাড়িতে যাচ্ছি। তোর কাছে ছোরা আছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"ওকে শেষ ক'রে দিয়ে আসিস্।"

"আচ্ছা।"

ভেতরে গেল আকবর। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল। তারপরে ঘুরে দাঁড়াল সে।

মুস্তাকের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে ধ্বনিত হচ্ছে।

আকবর তাকাল।

সুনন্দা মূর্ছিতের মত প'ড়ে আছে। অপরূপ নগ্ন কান্তি নিয়ে অপরিসীম বেদনায় সে মাটিতে লুটিয়ে আছে। ধীরে ধীরে এগোল আকবর।

সুনন্দা চোখ মেলল, গভীর ঘুমের মত গভীর বেদনার হাত থেকে সে যেন জোর ক'রে নিজেকে টেনে তুলতে চাইছে।

আকবর থামল।

সুনন্দা তাকে দেখল, একটু নড়বার চেষ্টা করল, পরে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও।"

নিজের ধমনীতে যে রক্ত মাথা খুঁড়ছে তার শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছে আকবর।

"ভাই, দয়া কর ভাই।"

বাজের ডাকের মত যেন 'ভাই' শব্দটা আকবরের কানে ধ্বনিত হ'ল। হঠাৎ যেন কি একটা হয়ে গেল, বেলুন থেকে যেমন সজোরে হাওয়া বেরিয়ে যায়, তেমনি ভাবে যেন তার চেতনা থেকে একটা উষ্ণতার বিষবাষ্প সবেগে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ যেন সে নিজেকে হাল্‌কা বোধ করল, সুস্থ বোধ করল। ভাই! এমন সুন্দরী একটি মেয়ের সে

ভাই! অনাস্বাদিত একটা রসে তার মনটা ভ'রে উঠল, আর্দ্র হয়ে এল।

সে উঠে দাঁড়াল। দরজার পরদাটা টেনে খুলে ফেলল, সেটা এনে সুনন্দার দেহের ওপর ফেলে দিল। তারপরে ঘরের কোণে রক্ষিত কুঁজো থেকে জল নিয়ে এল, ভাল ক'রে সুনন্দার চোখ মুখ মাথাটা ধুইয়ে দিল, তারপরে সস্নেহে বলল, "ডরো মৎ বহিন, ভয় পেয়ো না, আমি তোমার ভাই, সত্যি ভাই।"

সুনন্দার চোখে বিস্ময় দেখা গেল, দেখা গেল বাষ্পের গাঢ়তা।

আকবর কাঁদল। কেঁদে সে অবাক হয়ে গেল। এর আগে কখনও সে কাঁদে নি, কান্নার কথা সে ভাবতেই পারত না। কিন্তু এখন কাঁদতে যেন ভারী ভাল লাগল, ভারী আরাম বোধ হ'ল তার। বুকের ভেতরে কোথায় যেন বিরাট একটা শিলাখণ্ড চেপে বসেছিল তা আজ হঠাৎ যেন জল হয়ে গ'লে বেরিয়ে যাচ্ছে। আঃ—

"ভাই—ভাই—" সুনন্দা ধীরে ধীরে উঠে বসল, পরদাটা দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে নিল।

হাসিকান্নায় অপরূপ হয়ে আকবর বললে, "কেন বহিন?"

"আমি কি করব?"

"কি করবে বল?"

"আমার তো আর কেউ নেই—" সুনন্দা বিড় বিড় ক'রে বললে।

"চল, তোমায় হাসপাতালে দিয়ে আসি।"

"কিন্তু তারপরে—কোথায় যাব আমি?"

"আর কেউ নেই তোমার—কলকাতায়?"

"না।"

পাশের বাড়িতে—অজিতদের বাড়িতে তখন লুণ্ঠন ও হত্যালীলা শেষ হয়েছে। দল বেঁধে চীৎকার ক'রে ওরা তখন অন্যত্র যাচ্ছে।

সেই কোলাহল শুনে বেদনা-সমুদ্রে নিমজ্জিত আর একটা চেতনা এবার ফিরে এল, স্থনন্দা চমকে উঠল।

"আছে—আছে আমার সব চেয়ে বড় আত্মীয়, কিন্তু সে কি আর বেঁচে আছে!"

"কে সে?"

"পাশের বাড়ির ছেলে।"

আকবর মৃদু হাসল, "তুমি তাকে ভালবাস?"

স্থনন্দা মাথা নাড়ল। আর তার লজ্জার বালাই নেই।

"উঠতে পারবে?" আকবর প্রশ্ন করল।

"চেষ্টা করলে পারব।"

উঠল স্থনন্দা, আকবরের হাত ধ'রে। কিন্তু সোজা হতে পারছে না সে, খোঁড়াচ্ছে।

কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে যাবে ও-বাড়িতে? রাস্তা দিয়ে যাওয়া তো অসম্ভব।

অনেক ভাবল আকবর।

অবশেষে বুদ্ধি যোগাল।

এ-বাড়ির ছাদ আর ও-বাড়ির ছাদের মাঝখানে মাত্র পাঁচ-ছয় হাতের ব্যবধান। ছাদে কয়েকটা বাঁশ ছিল, একটা ভাঙা দরজাও নীচে আছে। বাঁশ ফেলে এ-ছাদের সঙ্গে ও-ছাদের যোগাযোগ করল আকবর, তার ওপর সেই ভাঙা দরজাটা এনে ফেলে দিল, ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাঁশ এবং দরজাটাকে বাঁধল।

সুনন্দার চোখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "পুল !"

আকবর হাসল নিঃশব্দে।

আবার ম্লান হয়ে এল সুনন্দার মুখ, "কিন্তু সে কি আর বেঁচে আছে ?"

আকবর ধীরকণ্ঠে বললে, "খোদার উপর ভরসা কর বহিন।"

রাত গভীর। আর সেই গভীর রাত কেঁপে উঠছে থেকে থেকে—বন্য কোলাহলে, নির্দোষের রক্তপাতে।

"চল বহিন—হুঁসিয়ার—"

"হোসেন !"—আজমল ডাকল দ্রুতকণ্ঠে।

"জী "

"শীগগির পরেশদের পালাবার ব্যবস্থা কর—মনে হচ্ছে যে ওরা আমাদের ওপর হামলা করবে।"

"কেন বাবা ?"

"ওদের বাড়ি থেকে দুজন লোক আমাদের বাড়ির ওপর নজর রেখেছে। না, এ কথা ব'লে ওদের দুর্বল করার দরকার নেই—তুমি একবার দেখে এস যে রাস্তা দিয়ে পুলিস যাচ্ছে কি না কিংবা কোন দিক দিয়ে ওদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় কি না ?"

"আচ্ছা।"

পেছন থেকে সাকিনা বললে, "হুসিয়ারিসে চল্‌না বেটা—"

"জী।"

একবার জাহানারার মুখের দিকে তাকাল হোসেন। তার পাণ্ডুর মুখের একটুখানি দেখেই সে মুখ ফিরিয়ে নীচে নেমে গেল।

ও-বাড়িতে ওরা পৌঁছেছে। অন্ধকার ঘর দোর।

আকবর দেশলাই জ্বালল।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল ওরা। পায়ের নীচে কি যেন আঠা-আঠা। তাকাল সুনন্দা। রক্ত। একপাশে অজিতের মা প'ড়ে আছে। তার ধড় কাটা।

"উঃ—মাগো—" সুনন্দা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে গেল। মা, বাবা, পিসী, মাসী—সবার কথা তার মনে পড়ল। আর মনে পড়ল অজিতের কথা।

ভেতরের দিকে গেল ওরা।

আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি। দেওয়ালে সুইচ। ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলল।

ঘরের মেঝেতে অজিত প'ড়ে আছে, মাথা ফেটে গেছে, হাতে ছোরার ঘা। বোধ হয় ম'রে গেছে।

ছুটে গেল সুনন্দা, ব'সে পড়ল, লুটিয়ে পড়ল, বিড় বিড় ক'রে বলল, "নেই—ও বেঁচে নেই—"

আকবর অজিতের নাড়ী টিপল। না, বেঁচে আছে ছেলেটা। ক্ষীণ নাড়ীর স্পন্দন। সে ছুটে বাইরে গেল, জলের কলসী নিয়ে এল, অজিতের কাপড় ছিঁড়ে তার মাথা ও হাতের ক্ষত ধুয়ে বেঁধে দিল।

"কেঁদো না—মৎ রোও বহিন—ও বেঁচে আছে।"

"না—না—"

"হ্যাঁ।"

"বেঁচে আছে!" সুনন্দা উঠে বসল, অজিতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল।

"হ্যাঁ।"

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে।

হঠাৎ যেন অঘটন ঘটল, মৃতদেহে প্রাণ এল। অজিত চোখ মেলল।

"জ-ল—"

আকবর জল দিল।

"অজিতদা—ও অজিতদা—"

"কে?"

"অজিতদা গো—"

"কে? সুনন্দা! তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি। শুধু আমরাই বেঁচে আছি—"

"চুপ—আর ব'লো না—আর সইতে পারব না।" অজিত চোখ বুজল।

একটু পরে সে উঠে বসল। আকবরের দিকে তাকাল।

"এ কে সুনন্দা?"

"আমার ভাই, আমাকে—আমাদের বাঁচিয়েছে।"

অজিতের পিঠে হাত রেখে আকবর হাসল।

"এবার তোমরা ওঠ, তোমাদের আমি হাসপাতালে রেখে আসি।"

"পারবে?"—অজিত প্রশ্ন করল।

"পারব, পারতেই হবে—নইলে তোমরা যে মারা পড়বে।"

অজিত সুনন্দার দিকে তাকাল।

সুনন্দা যেন হঠাৎ মুখরা হয়ে উঠল, "চল অজিতদা—আর—আর আমার কি হবে?"

"কেন?"

"আমার কেউ নেই—আমার কিছু নেই। এই রূপ আর দেহ নিয়ে কি হয়েছে, তা কি আমায় দেখে বুঝতে পারছ না?"

অজিত হাসল, নিঃশব্দে সুনন্দার হাত ধ'রে আকবরের সাহায্যে উঠে দাঁড়াল।

অজিত বলল, "তোমার ওসব কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না সুনন্দা—আজ চরম ক্ষতির বেদনাও আমি সইতে পারব তোমাকে পেয়ে। ভালই হ'ল, এমনি ঘা খেয়েই তো পুরোনো সমাজদেহের বিকারটা দূর হবে—আর তোমার লজ্জা কেন, ভয় কেন?"

আকবর মৃদুকণ্ঠে বলল, "আর দেরি নয়, এবার চল ভাই।"

"চল ভাই।"

হঠাৎ অজিত আকবরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তাকে বুকে চেপে ধরল, "ভাই—ভাই—"

"ভাই?"

"এ লড়াই থামাও।"

"থামবে।" দাঁতে দাঁত চাপল আকবর।

নিঃশব্দে, সতর্ক পদক্ষেপে ওরা নীচে নেমে গেল। নীচে নামতে নামতে হঠাৎ আকবরের বুকটা ফুলে উঠল। আঃ! তার

এতদিনকার সাধারণ জীবনে অসাধারণ ঘটনা ঘটল। এতদিনে সে মানুষের মত কাজ করল, এতদিনে সে বুঝতে পারল যে সেও ভাল কাজ করতে পারে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী—কঠিন কাজই বাকী। দাঙ্গাকে থামাতে হবে। জনগণেশকে ব'লে ক'য়ে নয়—তাতে কোন ফল হবে না। যাদের অঙ্গুলিহেলনে মূর্খেরা ওঠ্‌বোস্‌ করছে তাদেরই থামাতে হবে—একমাত্র তাদেরই। হঠাৎ কি একটা সঙ্কল্প জাগল আকবরের মাথায়, দু'চোখের তারায় যেন চকমকির আগুন জ্বলল।

আবার সেই উন্মত্ত কোলাহল।

অতি দূর থেকে নূতন একটা কোলাহল ভেসে এল, বোধ হয় মেডিকেল কলেজের ওদিকে—কলেজ স্ট্রীট থেকে—"জয় হিন্দ্‌—"

সঙ্গে সঙ্গে এদিকে তার পাল্‌টা জবাব বজ্রের মত কর্ণভেদী হয়ে উঠল, "আল্লা-হো-আকবর—"

ওদিকে সেণ্ট্রাল এভিনিউতে গরীব রিক্সাওয়ালারা জবাই হচ্ছে। রক্তাক্ত শয্যার মধ্যে শেষ স্বপ্নের মত তাদের বাড়িঘরের কথা মনে পড়ল। অনাড়ম্বর, কঠিন জীবন-যাত্রার কথা। দূর দ্বারভাঙ্গা ও মোতিহারী, ছাপরা ও মজঃফরপুরের গ্রামের কথা। সরলা গ্রাম্য প্রেয়সীদের কথা।

রিক্সা পুড়ছে, অসংখ্য রিক্সা। একটা মোটর-ট্রাকও পুড়ছে।

পোড়া রবারের উৎকট দুর্গন্ধ সে দুঃসংবাদের ঘোষণা ফিয়ার্স লেনেও জানাতে এসেছে।

"জয় হিন্দ্‌—" দূর থেকে বিপক্ষের চীৎকার আবার ভেসে এল।

"আল্লা-হো-আকবর—" এ পক্ষের ঘোষণা।

বিভীষিকাময়ী কালরাত্রি নেমে এসেছে মহানগরীর বুকে। আর তারই মধ্যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত ফিয়ার্স লেন। মানুষ আর মানুষ নেই। রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জার নীচে স্নেহ, মমতা ও ভালবাসার যে সুকুমার বৃত্তিগুলো মানুষের মধ্যে থাকে তা যেন সব হিংসার আগুনে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে।

হোসেন ফিরে এল।

"কি খবর বেটা?" আজমল ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মাথা নাড়ল হোসেন, "না, রাস্তায় পুলিস নেই। মাঝে একটা ভ্যানে কয়েকজন গেল, তারা থামল না, মাইক্রোফোনে ঘোষণা ক'রে গেল যে, রাত ন'টা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত 'কারফিউ অর্ডার' জারী করা হয়েছে।"

আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে—কে যেন বুক চাপড়ে কাঁদছে।

"তা হ'লে কি হবে?"

"সাগর দত্ত লেন দিয়েও গুণ্ডারা যাতায়াত করছে। তবে মাঝে মাঝে রাস্তাটা খালি থাকে—যখন ওরা গলির দক্ষিণ দিকে লুটপাট করতে যায়।"

দূর থেকে আর্তনাদ ও কোলাহল ভেসে এল। পুরুষের পৌরুষ, নারীর মর্যাদা, শিশুর অসহায়তা—সব আজ ধূলিসাৎ হয়েছে।

পরেশ দরজার ওদিক থেকে মুখ বাড়াল, একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সে আজমলের কাছে এগিয়ে এল।

"আজমল ভাই, কি করা যায় ?"

আজমল চমকে উঠল, চকিতে পরেশের বাড়ির জানলার দিকে তাকিয়ে সে নিম্নকণ্ঠে বলল, "শিগগির ঘরে যাও তুমি, যা হোক ব্যবস্থা করছি।"

কিন্তু অদৃশ্য চোখের তারায় তখন সে ধরা প'ড়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গেই পাশের বাড়ি থেকে একটা তীব্র হুইস্‌ল্ ধ্বনিত হ'ল এবং রাস্তায় কয়েকজন ধাবমান লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল।

তার পরেই আবার সব চুপচাপ।

গিরিবালা বাথরুমের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলেন। ভয়ে তিনি নড়তে পারেন নি—দেহটা যেন তখন পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছিল। অবর্ণনীয় এক ভয়ে তিনি তখন স্বামী, পুত্র, কন্যাদের অন্তিম চীৎকারেও সাড়া দেন নি, দিতে পারেন নি। সব কিছু ভেঙে ফেলছিল, লুট করছিল ওরা, তাও তিনি টের পেয়েছিলেন। বুকের পাঁজরায় তীব্র একটা বেদনার সঙ্গে লজ্জা, ঘৃণা আর আত্ম-ধিক্কারের সম্মিলিত চাপের সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পৃথিবীতে তিনি নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। প্রিয় স্বামী, রক্তের পুতুল যে সন্তানেরা—তারা তাঁর কাছে তখন নিজের চেয়ে দামী মনে হচ্ছিল না। এ কি লজ্জা! অথচ তার হাত থেকে

পরিত্রাণ পাবারও উপায় তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। স্থির হয়ে ঠায় এক জায়গায় তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তারপরে এক সময়ে সব শান্ত হ'ল, নরকের প্রেতেরা এক সময়ে চ'লে গেল বাড়ি থেকে, স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

গিরিবালা আবিষ্টের মত বেরোলেন ঘর থেকে।

ঘরের ভেতর গিয়ে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

স্বামী, দুই ছেলে, তিন মেয়ে—সবাই মেঝেতে প'ড়ে আছে। লাল রক্ত চক্‌চক্ করছে, গভীর ক্ষতগুলোকে দেখে চোখ বুজে আসে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন গিরিবালা। শুধু তিনি বেঁচে আছেন। সম্মোহিতের মত তিনি সবার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঠোঁট নড়ল তাঁর, শোনা গেল কথা, "ওগো—শুনছ—শুনছ—বেঁচে আছ ?"

না, কেউ সাড়া দিল না। কেউ বেঁচে নেই।

মিথ্যে নয়, চোখের ভুল নয়, ওরা সবাই মরেছে।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করলেন গিরিবালা। একটানা আর্তনাদ।

"আ—আ—আ—"

পরমুহূর্তেই তিনি হেসে উঠলেন, "হিহিহি—হিহিহি—শুধু আমি বেঁচে আছি—হিহিহি—"

ছুটে বেরোলেন তিনি ঘর থেকে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন, গলিতে বেরোলেন।

"শুধু আমি বেঁচে আছি—শুধু আমি—"

দূরে একটা বাড়ির রকে চার-পাঁচজন গুণ্ডা ব'সে বিড়ি টানছিল।

"ওগো, শুনছ, শুনছ বাবারা?"

"আরে ক্যা বোল্‌তা হ্যায় রে মৌগী?"

একজন ষণ্ডামত লোক উঠে দাঁড়াল।

"শোন বাবা, শোন। আমার কেউ নেই, কেউ নেই গো, সবাই মারা গেছে। একা—একা আমিই বেঁচে আছি, কিন্তু বড় কষ্ট বাবা—একা বেঁচে সুখ নেই, শান্তি নেই—"

"চোপ—চোপ মৌগী—"

হাতজোড় ক'রে হাসল গিরিবালা, "চুপ করব বাবা, চুপ করব, কিন্তু একটা কথা, একটা মিনতি—আমাকেও মেরে ফেল। দোহাই বাবা, তোর পায়ে পড়ছি—"

"হাঃ হাঃ হাঃ"—গুণ্ডারা হাসল।

"হাঁ? তু মরেগি?"

"হ্যাঁ বাবা, মারো, আমায় কুচি কুচি ক'রে কাটো, কুচি কুচি ক'রে—"

"তবে মর্"—ষণ্ডা লোকটি কোমর থেকে ছোরা বের করল।

একটা আর্তনাদ মাত্র। ব্যস্, সব শেষ।

"শীগগির—শীগগির"—আজমল বিবর্ণমুখে বলল, "ওদের আর বিশ্বাস করি না আমি, ওরা এখন পশু হয়ে গেছে, সব জ্ঞান হারিয়েছে।"

"আল্লা-হো-আকবর—"

সংবাদ পৌঁছেছে, রক্তলোভাতুর দুর্বৃত্তেরা উত্তেজিত হয়ে এদিকে ছুটে আসছে।

ঠক্ ঠক্ ক'রে পরেশের পা দুটো কাঁপছে। কাঁপছে নিবারণ, কাঁপছে মেয়েরা, কাঁপছে বাচ্চারা। কেবল সত্তর বছরের বুড়ীটা স্থির হয়ে আছে আর ভাবছে পঞ্চাননের কথা।

হোসেন ভাবছে।

আজমল তাকিয়ে আছে ছেলের মুখের দিকে।

সাকিনা, জাহানারা, ফতিমা ও রোশানারা নির্বাক হয়ে কান পেতে আছে কোলাহলের দিকে।

হোসেনের ছেলেটি একবার কেঁদে উঠল।

"মারো মারো, হিন্দুলোগকো খতম করো—"

দৌড়ে আসছে সবাই। সময় নেই।

হোসেন ব্যস্ত হয়ে উঠল, "বেরিয়ে আসুন, পেছনকার চোরাগলি দিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা—শীগ্‌গির"—

আজমল তাড়া দিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, শীগ্‌গির যাও ভাই—যান বহিন— "

ওরা সবাই বেরিয়ে এল।

নিবারণ ভাবছে। এবার হয় মৃত্যু, নয় জীবন।

গজানন ছেলেদের হাত ধরেছে।

পরেশ তখন কাঁদছে। ঠিক ভয় না, পরিত্রাণের সোনালী আশাও নয়, কৃতজ্ঞতার অশ্রু। নিঃশব্দে সে শুধু আজমলকে আলিঙ্গন করল।

বুড়ী বলল, "চললাম ছেলে, একটু নজর রেখো বাবা, আমার পাগলা পঞ্চাটা যে বাড়িতেই আছে।"—বুড়ীর গলা বন্ধ হয়ে এল।

ওদিকে পরেশের স্ত্রী সাকিনা বিবির হাত ধরেছে।

"আল্লা-হো-আকবর—" ওরা এসে পড়েছে। মশালের আলোতে ফিয়ার্স লেন আরও আলোকিত হয়ে উঠল।

কে যেন বলল, "দরওয়াজা বন্ধ্ হ্যায়।"

তাজ মহম্মদের গলা শোনা গেল, "ধাক্কা মারো, পুকারো আজমল খাঁকো—"

আজমল গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "শীগ্‌গির যাও, হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ী ঘেরাও করবে—"

"যাই আজমল—"

"এসো ভাই, আল্লা তোমাদের তদারক করবেন।"

ওরা লঘু পদক্ষেপে নেমে গেল।

"ও হাজী সাহেব—কেঁওয়ারী খোলো—"

দরজায় অনবরত ধাক্কা পড়ছে।

আজমল বাইরের বারান্দা থেকে ঝুঁকে বলল, "কি চাই? কাহে দিক্ করতে হো ভাই?"

নীচের থেকে সগর্জনে তাজ মহম্মদ বলল, "পহ্‌লে দরওয়াজা খোলো হাজী সাহেব, পিছে বাৎলায়েঙ্গে।"

"কিন্তু কেন—বলতে দোষ কি?"

"তুমি পাশের বাড়ীর হিন্দুদের লুকিয়ে রেখেছ।"

সময় চাই। ওদের হাসপাতালে পৌছনো পর্যন্ত এদের আটকাতে হবে।

আজমল মাথা নেড়ে শান্তভাবে বলল, "তুমি পাগল হয়েছ, তাই এমন কথা বলছ তাজ মহম্মদ।"

"খবরদার, ঝুট মৎ বোলো, হামারা আদমিয়োঁ নে আঁখসে দেখা হ্যায়।"

আজমল মাথা নাড়ল, "নেহি ভাই, মেরি বাৎকো মানো, ঘর যাও, আরাম করো।"

"দরওয়াজা খোলো হাজী—"

"ক্যা কাম ভাই ?"

তাজ মহম্মদ চীৎকার ক'রে উঠল, "তোড়ো শালেকো দরওয়াজা—শালা ঝুটা হ্যায়। হজ্ করকে ভি ঝুট বাৎ বোল্‌তা হ্যায় অওর কাফের লোগোঁকো জগাহ্ দেতা হ্যায়—তোড়ো, তোড়ো দরওয়াজা—"

"তোড়ো—হিন্দুলোগ অন্দরমে হ্যায়—" জনতার গর্জনে বাড়ীঘর কেঁপে উঠল।

আরও কিছুক্ষণ। আরও কিছুক্ষণ ওদের আট্‌কে রাখো। আজমল নীচে নামতে গেল।

সাকনা হাত ধ'রে টানল, "না, না, দোহাই তোমার, নীচে যেয়ো না—"

"নীচে যেয়ো না আব্বাজান—যেয়ো না—" মেয়েরা বলল।

"আমি মুসলমান—আমায় ওরা মারবে না।"

"না—না—"

"খোদা মালিক—ভয় পেয়ো না, তোমরা অপেক্ষা কর—আমি ওদের বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিই।"

জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে নীচে নামল আজমল। পেছনে পেছনে সাকিনাও গেল।

"আও মৎ বিবি।"—আজমলের আদেশ ধ্বনিত হ'ল।

সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়াল সাকিনা বিবি।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আজমল।

দরজার উপর ধাক্কা পড়ছে। সম্মিলিত ধাক্কা।

"তোড়ো—তোড়ো—বেইমানকো সবক্ শিখাও—"

আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখতে হবে, তা হ'লেই তার জয় হবে।

চীৎকার ক'রে আজমল বললে, "তোড়ো মৎ—খোলতেহে দরওয়াজা।"

ধাক্কা থামল। একটা পীড়াদায়ক নিস্তব্ধতা। বাঘের মত ওরা ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে।

দরজা খুলল আজমল। সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

তার সামনে বন্যার জলের মত জনতা এসে দাঁড়াল। সামনেই তলোয়ার হাতে তাজ মহম্মদ।

"কাঁহা হ্যায় হিন্দুলোগ?"—কর্কশ কণ্ঠে তাজ মহম্মদ প্রশ্ন করল।

আজমল মৃদু হাসল। আরও পাঁচ মিনিট।

সে বলল, "নেহি জানতেহে ভাই।"

পেছন থেকে কে একজন চীৎকার ক'রে বলল, "বুডঢা ঝুট বাৎ বোলতা হ্যায়।"

আজমল হাত তুলল, "কেন তোমরা এমন হয়ে গেলে ভাই?

পবিত্র কোরানে আল্লার আদেশ প'ড়ে দেখো—কোন নির্দোষের অপকার করতে নেই, কোনো নিরীহের প্রাণ নিতে নেই। তার মালিক খোদা—"

"চোপ রও ঝুটা কাঁহিকে"—তাজ মহম্মদ তাকে ধাক্কা দিল, "হঠ্ যাও—"

"না"—উত্তেজিত হয়ে উঠল আজমল, সারা শরীর তার আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছে, "আমার কথা শোন ভাইসব, দুনিয়ার সব একই মালিকের সন্তান, সবাই আমরা ভাই ভাই। স্বার্থ নিয়ে লড়াই করার অনেক রাস্তা আছে, এ রাস্তা মঙ্গলের নয়। শুনে রাখো, হিংসায় শুধু হিংসা বাড়ে, জোর ক'রে কখনো মানুষের মত পাওয়া যায় না—"

"মারো, মারো শালেকো"—জনতার নিষ্ঠুর রায় ঘোষিত হ'ল।

আজমল জামাটা ছিঁড়ে ফেলল, পাকা চুলে ভর্তি বুকটাকে এগিয়ে দিয়ে আরও চেঁচিয়ে বলল, "এই নাও আমার খোলা ছাতি, মারো, কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু ভাইসব, জোর ক'রে যা আদায় করতে চাও তা হিংসার পথে কতদিন আগলে রাখবে? ক্ষমা কর, ভালবাস, আল্লার আদেশকে পালন কর—"

"হঠ্ যাও"—তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল তাজ মহম্মদ, "শালা কাফেরকো সাথ্ মিলকে কাফেরহি বন্ গিয়া।"

সাকিনার আর্ত চীৎকার ভেসে এল, "লওটো—লওটো জনাব—"

"মারো—ইয়েহ্ দুশমনোঁকো সাথ দেনেবালেকো মারো"—জনতার আদেশ ধ্বনিত হ'ল।

দরজাটা আঁকড়ে ধ'রে সামলে নিল আজমল, বলল, "মেরে ফেলো,

কোরবানি দেবার জন্যই খোদা আমায় তৈরি করেছেন, মারো, কিন্তু তোমরা শান্ত হও ভাই, প্রকৃতিস্থ হও।"

ভয়াবহ হয়ে উঠেছে তাজ মহম্মদের মুখচোখ, বাঘের মত দাঁতে দাঁত ঘ'ষে হঠাৎ সে তলোয়ারটাকে উত্তোলিত করল। সাকিনার চীৎকার শোনা গেল, শোনা গেল তার মূর্ছিত দেহের পতনশব্দ সিঁড়ির ধাপের ওপর, শোনা গেল জাহানারা ফতিমা ও রোশানারার আকুল কান্না, জনতার নিশ্বাসের শব্দ। আর ঘাড়ের ওপর থেকে কণ্ঠনালী স্পর্শ ক'রে তলোয়ারটা পঞ্জরে আটকে গেল।

"খোদা" ব'লে একটা ডাক ছেড়ে টলতে লাগল আজমল। রক্তাক্ত দৃষ্টিটা তার একবার সামনের দিকে বিস্ফারিত হয়েই মুদ্রিত হয়ে গেল। আর পিচকারীর মত রক্তের ধারায় তাজ মহম্মদের বুটিদার পাঞ্জাবিটা এবার লাল হয়ে উঠল। আজমল সশব্দে প'ড়ে গেল।

তলোয়ারটা সজোরে টেনে বের ক'রে তাজ মহম্মদ হুকুম দিল, "অন্দরমে যাও আধা, অওর বাকী সব পিছেকো রাস্তাসে আগে বাড়ো—"

চার-পাঁচজন লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু হঠাৎ জনতা যেন নির্বাক হয়ে গেছে। একজন দুজন ক'রে তারা স'রে পড়তে আরম্ভ করেছে। অনেকে মাথা নীচু ক'রে আছে। জনতা ভাঙতে চলেছে। ওদের হঠাৎ লজ্জা হয়েছে, অনুশোচনাও বোধ হয়। ওরা মুসলমানকে বধ ক'রে কোনো আনন্দ পেল না। হঠাৎ কেমন যেন দুর্বল বোধ করছে ওরা। লোকটা হাজার হোক হজযাত্রা করেছিল। লাল রক্তের ধারার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ওদের নেশা যেন কাটতে থাকে।

একজন আর থাকতে পারল না, বলল, "আখের মুসলমানকো মারা হামলোগ—আপনা ভাইকো মারা!"

ভেতরকার লোকেরা বেরিয়ে এল, "কোই নেহি হ্যায়। পিছেসে ভাগা হ্যায় শালেলোগ।"

গর্জন ক'রে, রক্তাক্ত তলোয়ারটাকে আন্দোলিত ক'রে তাজ মহম্মদ বলল, "আফশোষ না করো, খোদাকা ইস্তকাম জবরদস্ত হ্যায়, রহমসে মুসলমানকো কাম নেহি বনেগা—আও, মেরা সাথ আও।"

যেদিক দিয়ে হোসেন গেছে সেদিকেই গেল তাজ মহম্মদ। কিন্তু সবাই আর সঙ্গে গেল না। দশ-বারো জন ছাড়া সবাই এদিক ওদিক চ'লে যেতে লাগল। আজমলের রক্তের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে।

সাকিনার মূর্ছা তখনও ভাঙে নি। জাহানারা, ফতিমা ও রোশানারার কান্না পাক খেয়ে খেয়ে বেরিয়ে আসছে ফিয়ার্স লেনে।

কয়েক মিনিট কাটল।

বাড়ির সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল।

সাকিনার মূর্ছা ভেঙেছে। মেয়ে দুটো সিঁড়িতে মাথা ঠুকে ঠুকে বিলাপ করছে। সাকিনা হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে, অবশ হয়ে গেছে। আর কেউ এগোচ্ছে না আজমলের দিকে। গ্যাসের আলোর রেশ এসে দেহের ওপর পড়েছে, তার লাল রক্ত তার স্পর্শে চক্‌চক্ করছে। হঠাৎ যেন অপূর্ব একটা পবিত্রতার আধার হয়ে উঠেছে আজমল। তাকে যেন আর ছোঁয়া যায় না।

অন্ধকার গলিটার মুখে এসে আকবর থামল। এখানেই দাঁড়ালে চলবে। হাতের ছোরাটাকে সে দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরল। আর সন্দেহ নেই, আর সমস্যা নেই। সব এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। যে পাষণ্ডের নির্দেশে আজ জনতা ভ্রান্ত, তাকে সরালেই দাঙ্গা থামবে। অনেক পাপ করেছে সে, অনেক অন্যায় করেছে। কিন্তু আর নয়। আজ একদিনেই সে তার সমস্ত অতীতটাকে মিথ্যে ক'রে দেবে। আগুনের শিখা তার অন্তরে জ্ব'লে উঠেছে তাতে সে আজ হাউইয়ের মতই জীবনটাকে পুড়িয়ে নিঃশেষ ক'রে দেবে, আকাশকে আলোকিত ক'রে তুলবে। দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে সে ফিয়ার্স লেনের দিকে তাকাল। তার দুটো চোখে যেন আগুন ঝলসাতে লাগল, কানের পাশের শিরাগুলো দপ্ দপ্ ক'রে লাফাতে লাগল। তাজ মহম্মদ এখুনি আসবে।

কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফতিমারা তাকাল। লোকটা যেন টলছে। তাকে দরজার গোড়ায় দেখাও গেল। হোসেন। তার জামা ছেঁড়া, তার বাঁ চোখের ওপর রক্তাক্ত ক্ষত-চিহ্ন, তার জামার ও বুকের ওপরকার কায়েদ-এ-আজমের ছবির ওপরেও কয়েক ফোঁটা রক্ত। তাজ মহম্মদের হাত থেকে সে পালিয়ে আসতে পারত না যদি না ঐ ছবিটা থাকত।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল, বিস্ময় ও ত্রাসের সঙ্গে তার দুই বোন ও স্ত্রীর কান্না শুনে সামনে তাকাল, অস্ফুট একটা

ঘড়ঘড়ানি তার গলার মধ্যে ধ্বনিত হ'ল, শেষে অনেক কষ্টে বলল, "আ-ব্বা-জা-ন—"

সে টলতে লাগল, একবার অসহায়ভাবে তাকাল সামনের গ্যাস-লাইটটার দিকে, তারপর সে হাঁটু গেড়ে আজমলের পাশে বসল, অতি সন্তর্পণে সে পিতার দেহে হাত রেখে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, "শুনছেন? জনাব, এ বান্দা আপনার হুকুম তামিল করেছে।" কান্নায় তার বলিষ্ঠ দেহটা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল আর দুটো চোখের তারা দিয়ে যেন রক্ত-মিশ্রিত জল বেরিয়ে আসতে লাগল।

ওদিকে আর্তনাদ আর বিলাপ ভেসে আসছে। অসংযত জনতার তাণ্ডব-লীলার শব্দ। শোনা যাচ্ছে 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি। শোনা যাচ্ছে দরজা জানলা ভাঙার শব্দ। লক্ষপতিরা পথের ভিখারী হচ্ছে, সযত্নে লালিত কত প্রাণ মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, রক্তের ধারায় নারীর অশ্রু মিশ্রিত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য বিষাক্ত রসায়ন তৈরি হচ্ছে। মহানগরীর বুকে নরক নেমে এসেছে। আর সেই নরকের মধ্যে বিচ্ছিন্ন আর একটা দ্বীপ, আর একটা নরকের মত এই ফিয়ার্স লেন। আজ আর গলির অন্ধকার কোণে চীনা গণিকাদের কলহাস্য নেই, নেই সিনেমার গান, মেহের বিবির আলাপ। আজ রক্তাক্ত পথ, আজ গ্যাস-লাইটের আলোর পাশে ভৌতিক অন্ধকার। আজ ফিয়ার্স লেনের মধ্যে অসংখ্য প্রেতের দীর্ঘশ্বাস, আর বিচার-কামনা।

কিন্তু কিছুতেই কি থামবে না? কিছুতেই না? পিতার রক্তের দিকে তাকাল হোসেন। ভয় নেই। এখনও বসির চাচা আছে, মিঞা জাফরুল্লা আর খালেক মিঞা আছে। তারা হার মানবে না। হ্যাঁ,

আরও রক্ত ঢালতে হবে। আত্মবলি আর রক্ত দিয়েই এই রক্ত-বন্যাকে থামাতে হবে। মনুষ্যত্বের জয় হবেই।

রাত গভীর। ফিয়ার্স লেনে রাত গভীর হয়েছে। কিন্তু লিন-টিংয়ের বুদ্ধ-মূর্তির সামনে তখনও সেই মোমবাতিটা জ্বলছে।

আর প্রেতের মত গলির মুখে আছে আকবর দাঁড়িয়ে। ছোরা হাতে, জ্বলন্ত চোখে। তাজ মহম্মদ আর বাঁচবে না। অন্ধকারেও তার চোখের দীপ্তিতে সেই শপথকে পড়া যায়।

কোথায় যেন দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠল। উত্তর দিকের আকাশটা সেই আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠল। রক্তের মত লাল ও ভয়াবহ।

শেষ